বিদ্যা বাহিনী

ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবা

অনুবাদ ঃ নীতীন্দ্র নাথ মজুমদার
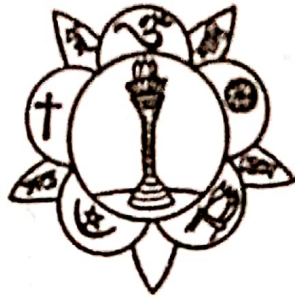
শ্রী সত্য সাই বুক্স এ্যান্ড পাবলিকেশন্স ট্রাস্ট, পশ্চিমবঙ্গ

১৬৩, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড

কলকাতা-৭০০০১৪

এই বইটি

বাবা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এই বাহিনীতে ব্যবহৃত বিদ্যা শব্দটি বোঝাচ্ছে। যা কিছু "আলোকিত" (বিদ্) করে। ঠিক এই অর্থেই আত্ম-বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা ইত্যাদি পরিচিত, এমন কি প্রশান্তি নিলয়মের যে এলাকায় শ্রী সত্য সাই উচ্চ শিক্ষা পর্ষদ অবস্থিত তার নাম বিদ্যা গিরি, সেই অর্থেই রাখা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম কল্যাণকর নিম্ন বিদ্যা, যেমন, সিদ্ধান্ত, অনুসিদ্ধান্ত, অনুমিতি, উপপত্তি, ধারণা, ব্যাখ্যা, ইত্যাদি সম্পর্কে বাবা আমাদের অবহিত করে থাকেন। জানবার এবং সত্যম শিবম সুন্দরম হয়ে উঠবার বিশ্বজনীন আগ্রহকে উচ্চতর বিদ্যা ত্বরান্বিত ও প্রসারিত করে। নিম্ন বিদ্যার পেছনে অন্ধের মত ধাওয়া করবার মত যে ভুল মানবজাতি করছে তাকে ঠিক করবার স্ব-আরোপিত উদ্দেশ্য নিয়ে বাবা মানবজাতির ভেতর মানবরূপে নেমে এসেছেন। মানবজাতির এই সমুদ্র যাত্রায় তাকে কাত না হয়ে সমানভাবে চলতে হবে। কিন্তু পরিবর্তে তা বিপজ্জনকভাবে সামুদ্রিক কবরের দিকে হেলে পড়েছে। নিম্নবিদ্যা তাকে অতল গহ্বরে নামিয়ে দিচ্ছে। বিদ্যাই হল এর একমাত্র ঔষধ।

শিশুকাল হতেই বাবা শিক্ষক ও গুরু হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছেন। গ্রামবাসীগণ তাঁকে গুরু বলে সম্বোধন করতে ভালবাসত। কোন প্রকার সংকোচ কিংবা ইতঃস্তত না করেই পুট্টাপর্তির বয়স্কদের, স্কুলের শিক্ষকদের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান বা মোড়লদের তিনি পশুদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার ও শ্রমিকদের শোষণ, অতি সুদে ঋণ দান জুয়াখেলা, পান্ডিত্যাভিমান ও অশিক্ষা, ভন্ডামি ও আড়ম্বরের কুফল সম্পর্কে সাবধান করে দিতেন। কৌতুক নক্সা, হাস্য রচনা, ব্যঙ্গ রচনা ও বিদ্রুপাত্মক কাব্য, সঙ্গীত ও নাটকের মাধ্যমে এসব দোষে দুষ্ট সমাজকে উপহাস ও একই সঙ্গে সংশোধন করে গেছেন। মাত্র সতের বছর বয়েসে ১৯৪৩ সালেই তিনি সমবেত ভজন গানের মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে সত্য, ধর্ম, শান্তি, প্রেম ও অহিংসার শাশ্বত বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। এইগুলো হল মৌলিক অর্জন, যা উচ্চতর বিদ্যা শিক্ষার্থীদের উপর বর্ষণ করতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্", "সকল বিদ্যার ভেতর আমি হলাম আত্মবিদ্যা"। এই বিদ্যার দ্বারাই জগতকে আত্মহননের পথ হতে রক্ষা করা সম্ভব। সত্য এবং পূর্ণতা, একতা এবং পবিত্রতার অন্বেষণ হল এর পথ, এর

উপলব্ধি হল এই প্রচেষ্টার সমাপ্তি। এই বাণীই হল গত পঞ্চাশ বছর ধরে প্রদত্ত তাঁর সকল দিব্যভাষণের মূল বক্তব্য।

আমাদের ভেতর এবং জগতের ভেতর শান্তি ও স্বাধীনতাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার এক কার্যকরী যন্ত্র হিসেবে শিক্ষার পুনর্বাসনে যে সকল নীতি আমাদের পরিচালনা করা উচিৎ সেগুলোর বিপদ ব্যাখ্যার জন্যে ভক্তদের প্রার্থনার উত্তরে তিনি যে উনিশটি নিবন্ধ ভগবান বাবা রচনা করেছিলেন সেগুলো পাঠ করবার এক অমূল্য সুযোগ এই মূল্যবান গ্রন্থটি আমাদের সামনে এনে দিয়েছে।

এন কস্তুরী
সম্পাদক,
ইংরাজী সনাতন সারথি।

প্রশান্তিনিলিয়ম
১৪ই জানুয়ারী ১৯৮৪

এক

যার জন্ম নেই তার কোন শুরুও থাকে না। প্রত্যেক বা যে কোনও বস্তুর আগে তা বর্তমান ছিল। তার পূর্বেই অস্তিত্ব ছিল এমন কিছুই থাকে না। তাই এর কোন অন্তও নেই। তার ইচ্ছা অনুযায়ী সে প্রসারিত হয়, স্ব-সংকল্প অনুসারে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়, এবং নিজ পূর্ণতা দ্বারা জগতকেও পূর্ণ করে তোলে। এই **পরমতত্ত্ব হল বিদ্যা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রতীতি।**

বহু দ্রষ্টা এই অনুপম প্রতীতির বহুমুখী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের অন্তরালে যে নিয়ন্ত্রণকারী গূঢ় রহস্য বর্তমান তাকে স্ব স্ব আলোকপ্রাপ্ত অন্তরে দর্শন করেছেন। মানবজাতির প্রতি অপার করুণাবশতঃ ঐ ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জিত হবার জন্যে মানব অন্তরের সহজাত ব্যাকুলতাকে উজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে নিজেদের ঐ দৃষ্ট অভিজ্ঞতাকে দ্রষ্টাগণ মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বিদ্যা দ্রষ্টাদের অন্তরে এই প্রকাশের আকুলতাকে জাগ্রত করে।

শব্দ হল বেদের অন্তঃসারস্বরূপ। শব্দ সমতান ও স্বরমাধুর্য দ্বারা আবদ্ধ এবং তাই বেদকে শ্রবণ করতে হয় এবং শ্রবণের মাধ্যমেই দিব্যানন্দ লাভ হয়। বেদকে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা বিচার করা চলে না। এর জন্যেই বেদকে বলা হয় শ্রুতি (যা শ্রবণ করা হয়)। তার আবৃত্তি শ্রবণের মাধ্যমেআত্মজ্ঞান লাভ ও আত্মজ্ঞান পরিবেশিত পরমানন্দ লাভ সম্ভব। এভাবে অর্জিত পরমানন্দ বাক্য ও কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে চতুর্দিকস্থ সকলের আনন্দ বর্ধন করে।

বিশেষ এক দার্শনিক মতবাদকে বোঝাবার জন্য বেদান্ত শব্দটিকে অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বেদান্ত হল বৈদিক সাহিত্যের বিশেষ একটি খণ্ড মাত্র। সকল উপনিষদীয় গ্রন্থ বেদান্তের অংশবিশেষ। বৈদিক চিন্তাধারার পরিসমাপ্তি হল বেদান্ত। বেদ নিজেই পরম অভিমুখে যাবার শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশক। ঋক্ অথবা ঋক্ বেদের স্তোত্রসমূহ হল বহিঃস্থ প্রকৃতির সুশৃঙ্খলতা ও সৌন্দর্য মননকালে লব্ধ দিব্য আনন্দের ভাবোচ্ছ্বাস। সামবেদ হল এক মূল্যবান বাঙ্ময় সম্পদ যা মানুষকে সুর লহরী ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির গুণকীর্তন করতে সাহায্য করে। ইহলোক ও পরলোকের রহস্য অথর্ববেদে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। হিতকর বা ফলপ্রদ বা যজ্ঞীয় আচার ও অনুষ্ঠানের মন্ত্র যজুর্বেদে সংকলিত হয়েছে।

এই চারটি বিভিন্ন নামযুক্ত সংকলনে বিন্যস্ত বৈদিক সাহিত্যের আবার চারটি করে শাখা রয়েছে---মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। মন্ত্র অংশকে সংহিতাও (সংগ্রহ) বলা হয়, সকল পবিত্র সূত্র (মন্ত্র) এখানেই সন্নিবেশিত। যে গ্রন্থাংশে এই সকল মন্ত্রের বিনিয়োগের ও সঠিক আবৃত্তির মাধ্যমে উপকৃত হবার উপায় ও পদ্ধতি নিবদ্ধ হয়েছে তা হল ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মা শব্দটি হল বহু অর্থ-জ্ঞাপক। ব্রাহ্মণ শব্দ সমষ্টিতে ব্রহ্মার অর্থ হল মন্ত্র। ব্রাহ্মণ মূলতঃ অনুষ্ঠান ও সমজাতীয় বাহ্যিক ক্রিয়ার আলোচনা করেছে। আরণ্যকে কিন্তু অন্তর্নিহিত তাৎপর্যসমূহ এবং ইন্দ্রিয়দমন, বাসনা ত্যাগের ন্যায় আভ্যন্তরীণ নিয়মনিষ্ঠার পর্যালোচনা করা হয়েছে। দার্শনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপনিষদ এই দুটো পথের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করেছে। উপনিষদ হল বৈদিক আলোচনার শেষ ধাপ এবং বেদান্ত নামে অভিহিত। বেদান্তকে বৈদিক শিক্ষার নির্যাসরূপে ধরা যেতে পারে। যাহল সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রের সার। যিনি সমগ্র বেদ শাস্ত্রকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, সেই পন্ডিত ব্যক্তির নিকট দুগ্ধ মন্থন দ্বারা লভ্য নব নীড় ন্যায় বেদান্ত প্রকট হয়ে ওঠে।

এখানে আলোচিত বৈদিক সাহিত্যের সবকটি রূপ নিয়ে গঠিত হয়েছে জ্ঞানের প্রাচীনতম দেহ, বিদ্যা। "উপনিষদ" শব্দটি তৈরী হয়েছে উপ এবং নি এই দুটো উপসর্গের সঙ্গে 'সদ্' ধাতুর যোগে। 'সদ্' শব্দের অর্থ হল 'উপবেশন'। 'নি' বলতে 'অবিচল', 'নিষ্ঠ' বোঝায়। 'উপ' বোঝায় 'নিকট'। ছাত্রকে গুরুর (আচার্য) নিকট উপবেশন করে জ্ঞাপিত বক্তব্যের প্রতি অবিচল মনোনিবেশ করতে হবে। তাহলেই সে জ্ঞানভান্ডার ও বিচারশীলতা লাভ করতে সক্ষম হবে।

উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা, — এই তিনটি হল ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার মূল ভিত্তি। এদের একত্রে বলা হয় প্রস্থানত্রয়।

এই পার্থিব বস্তুতান্ত্রিক জগৎ হল, যা চক্ষু দ্বারা দৃশ্যমান, যা ইন্দ্রিয়কে সুখ দেয়, যা মনকে আকৃষ্ট করে এবং যা আমাদের মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরণ করে। কিন্তু এই জগতেই এবং এই জগতের মধ্য দিয়েই অধিগম্য এক অপার্থিব অধ্যাত্মিয় জগৎ বর্তমান আছে। সেই জগতকে জানতে পারলে দুটো জগতই এক অবিভাজ্য চৈতন্যের আংশিক প্রকাশরূপে প্রতিভাত হয়। এক অখন্ড পূর্ণে এই দুটো পরস্পর সম্পূরক। পরব্রহ্ম (পূর্ণ) হতে জীব (ব্যক্তি অর্থাৎ পূরক) উদ্ভুত।

যে পার্থিব দেহে সে আবদ্ধ, তা ত্যাগ করলে জীব অর্থাৎ নিত্য বিশ্বজনীন চেতনা পুনরায় সেই এক পূর্ণ সত্তা, পরব্রহ্ম। পূর্ণম অদম্ (উহা পূর্ণ), পূর্ণম ইদম (ইহা পূর্ণ), পূর্ণাৎ পূর্ণম উচ্যতে (পূর্ণ হতে পূর্ণের উৎপত্তি হয়েছে), পূর্ণস্য পূর্ণ আদায় (পূর্ণ হতে যখন পূর্ণকে নেওয়া হয়) পূর্ণমের অবশিষ্যতে (শুধুমাত্র পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে)।

বিদ্যা এই শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, ব্রহ্মান্ড হল ঈশ্বরের লীলার অভিব্যক্তি মাত্র, আর কিছুই নয়। উপনিষদ এই সত্যকে এভাবে প্রকাশ করেছেঃ "ঈশাবাস্যম ইদম জগৎ"। এই জগৎ প্রভুর আবাসস্থল হবার যোগ্য, সত্যিই তা ঈশ্বরের আবাস। সুতরাং কেউই ব্যক্তিগত অধিকারবোধ বা কণামাত্র অহমিকাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। আসক্তিবোধ পরিত্যাগ কর, ঈশ্বরের উপস্থিতি সর্বত্র অনুভব কর। ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ হয়ে তোমার প্রতি যে আনন্দ বর্ষণ করেছেন তাকে স্বাগত জানাও এবং কৃতজ্ঞচিত্তে ও বাসনা দ্বারা আবদ্ধ না হয়ে তাকে অনুভব কর। এই হল ঋষি ও দ্রষ্টাদের বাণী।

'আমি' ও 'তুমি' বোধকে পরিত্যাগ কর, একমাত্র তাহলেই যা 'আমি' বা 'আমার' নয়, তার মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে। এর অর্থ এই নয় যে তোমাকে সবকিছু বর্জন করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা (বিদ্যা) নির্দেশ দেয় যে, কর্তব্যের দাবী অনুযায়ী, নিরাসক্ত মন নিয়ে, ফাঁদ এড়িয়ে এই জগতের সংস্পর্শে আসতে হবে। কর্মটি আসক্তি বর্ধন করে, না তা বন্ধন পরিহার করে, তার বিচারই হল কোন কর্ম পবিত্র ও শুদ্ধ কিনা স্থির করবার নিশ্চিত পরীক্ষা। কোন কর্ম অপবিত্র ও পাপযুক্ত কিনা তা বিচার করতে হলে পরীক্ষা করতে হবে, সে কর্ম লোভ হতে উদ্ভূত এবং লোভ বর্দ্ধক কিনা। এই হল বিদ্যা হতে লব্ধ শিক্ষা। বিদ্যার উপদেশ। বৈধ কর্তব্য সম্পাদনের ইচ্ছা নিয়ে তোমায় শতবর্ষ জীবিত রাখবার জন্যে তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাতে পার। তাহলে তুমি নিন্দিত হবে না। প্রতিটি কর্মের প্রকৃতি ও ফলকে সম্পূর্ণভাবে জেনে সেই কর্মে লিপ্ত হতে বিদ্যা তোমায় উপদেশ দিয়ে থাকে।

পশু শুধুমাত্র অন্য পশুকে হত্যা করে কিন্তু যে ব্যক্তির আত্মদর্শন হয়নি তেমন অন্ধ ব্যক্তি নিজেকেই হত্যা করে থাকে এবং বিদ্যা সতর্ক করে দেয় যে, এই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি ঘোরতর তমিস্র রজনীর ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়াবহের রাজ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। বিদ্যা অর্থাৎ পরম প্রজ্ঞা, মানুষের নিকট আত্মার "বৈশিষ্ট্য"

বর্ণনা দেবার চেষ্টা করে। আত্মার কোন গতি নেই কিন্তু তা সর্বত্র বিরাজমান। এমন কি দেবগণও এর সঙ্গে গতির সমতা রক্ষা করতে পারে না। আমরা যত দ্রুত গতিসম্পন্নই হই না কেন, তার উপস্থিতি সম্পর্কে আমাদের অনুমিত সময়ের বহু পূর্বে সে তার উপস্থিতি প্রকাশ করে। আত্মা হল অব্যয় ও সর্বব্যাপী। বিদ্যা ঘোষণা করে যে, আত্মাকে নিরূপণ করা হল এক অসম্ভব কাজ।

যখন কেউ পরম প্রাজ্ঞতা বা বিদ্যার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয় তখন আত্মা ও অনাত্মা, বিদ্যা ও অবিদ্যা, বিকাশ ও বিনাশ — এই 'দ্বন্দ্ব'-এর পার্থক্য তার নিকট লোপ পেয়ে যায়। অতীন্দ্রিয়বাদী ও ঋষিগণ ঐ উচ্চতর একত্বের স্তর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং তাদের কৃচ্ছ্রসাধন ও সফলতার ইতিহাস বিদ্যা কর্তৃক প্রণোদিত হয়ে সাহিত্যে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঋষিদের জন্যে, ঐ স্তরের জ্ঞান হল অজ্ঞানের তুল্য ভয়াবহ। তারা এ দুটোরই উৎস ও পরিণামের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে অবগত। অ-জ্ঞান দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে এবং জ্ঞানের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করতে তাঁরা সক্ষম।

দুই

শুদ্ধ অন্তঃকরণ যখন তার উন্মেষক আলোক বিকিরণ করে তখনই বিদ্যা অথবা উচ্চতর শিক্ষার মহান তাৎপর্য উপলব্ধি করা অথবা অপরের নিকট তা ব্যক্ত করা সম্ভব। খুব যত্নের সঙ্গে একটি ঘরকে পরিষ্কার রাখলে সাপ, কাঁকড়াবিছে বা বিষধর কীট সেই ঘরে ঢুকতে পারে না। একই কারণে পবিত্র প্রাজ্ঞতা অন্ধকার অথবা মলিন হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না। অপর দিকে বিদ্যার আলোকবিহীন সমস্ত হৃদয় হল ক্রোধের ন্যায় বিষাক্ত নানা প্রজাতির উপযুক্ত আশ্রয়স্থল।

কয়লাকে তার রং হতে মুক্ত করতে কেউ চাইলে সাবান এবং জল কি কোন সাহায্য করতে পারে? কয়লার টুকরোটিকে দুধ দিয়ে ধুলেও কোন লাভ হয় না। একমাত্র উপায় হল তাকে আগুনে ফেলে দেওয়া। তার ফলে তা সাদা ভস্মে রূপান্তরিত হবে। একই ভাবে, কেউ অজ্ঞানতার অন্ধকার ও বাসনার মলিনতাকে দূর করতে আগ্রহী হলে তাকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করতে হবে। কেবলমাত্র আলোকের সাহায্যেই অন্ধকার দূর হতে পারে। অধিকতর অন্ধকার দিয়ে আক্রমণ করে অন্ধকারকে বশীভূত করা যায় না। আভ্যন্তরীণ অন্ধকারকে

দূর করবার জন্যে প্রয়োজনীয় আলোক হল বিদ্যা। বিদ্যা আন্তর জ্যোতি প্রদান করে। বিদ্যা হল প্রামাণ্য পুরুষোত্তম যোগ, গীতায় বর্ণিত পরম পুরুষের যোগ, পরম বিষয়ক জ্ঞান, উচ্চতর শিক্ষা। অর্থ দ্বারা এই যোগ ক্রয় করা যায় না, বন্ধুদের কাছ থেকেও লাভ করা যায় না, কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর নিকট এর জন্যে অর্ডার পেশ করা যায় না। একে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে, অবিচল বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তির মাধ্যমে প্রত্যেককেই নিজের জন্যে তা অর্জন করতে হবে।

'God is no where' (ঈশ্বর কোথাও নেই) এই শব্দ সমষ্টির প্রতিবাদ করবার বা সম্মুখীন হবার কোন প্রয়োজন নেই। যা করতে হবে তা হল, 'where' শব্দটির 'w'-কে 'no' (না) শব্দের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে; ফলে তৈরী হয়ে যায় 'God is now here' (ঈশ্বর এখন এখানে)! নেতিবাচক বক্তব্য হঠাৎ অস্তিবাচক হয়ে গেল। তেমনি জগতের উপর নিবদ্ধ বর্তমানের বহুমুখী দৃষ্টিকে কেবলমাত্র একীকরণের মাধ্যমে ভেদভাব দূরীভূত হয় এবং বহু হয়ে যায় এক।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, জয়দেব, শ্রীগৌরাঙ্গ, তুকারাম, তুলসীদাস, রামদাস, কবীর দাস, সারদাদেবী, মীরাবাঈ, শক্কুবাঈ, মল্লাম্মা, এদের কেউই বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং শাস্ত্রগ্রন্থের বাস্তবসম্মত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন নি, তা সত্ত্বেও আজকের দিনেও সকল মতের বিশ্বাসী, সকল ধর্মের অনুগামী ও সকল দেশের অধিবাসীগণ কর্তৃক তাঁরা পূজিত। স্বভাবতঃই এর কারণ হল অন্তঃকরণ পবিত্রকরণের মাধ্যমে আত্মার অবিচল বিশ্বাস অর্জন। কেবলমাত্র অন্তরের বিদ্যাই তাঁদের ঐ পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা প্রদান করেছিল।

ঐ সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তিগণ তাঁদের অন্তঃকরণে যা ছিল, তাঁরা যা অনুভব করতেন, বা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তাই তাঁরা ব্যক্ত করতেন। ভেবে দেখ, আজকের দিনে বিদ্যার অধিকারী বলে যারা দাবী করে থাকে তাদের কথা। লক্ষ লক্ষ লোকের ভেতর এমন কি একজনও যে মনে যা আছে তা যে কথায় প্রকাশ করে না, এ ঘটনা কি সত্য নয়? তারা বছরে একবার সত্যনারায়ণের, সত্যরূপী নারায়ণ বা ঈশ্বরের, পূজো করে থাকে, আর সারা বছরের প্রত্যেকদিন অসত্য-নারায়ণ, অসত্যের ঈশ্বরের পূজো করে। বস্তুগত পাণ্ডিত্যের বাসনা এধরণের আরাধনা থেকেই আসে। এই জ্ঞান কি বিদ্যা আখ্যা লাভের উপযুক্ত? না, কখনই নয়।

থালায় রাখা খাদ্য যদি গ্রহণ করা না হয় কিংবা কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হলেও তা যদি অগৃহীত অবস্থায় পড়ে থাকে, তবে সে খাদ্য নষ্ট হয়ে যাবে। তেমনি আমাদের ত্রুটি বা অক্ষমতাকে যদি আমাদের নিজেদের চেষ্টায় কিংবা পবিত্রকরণে সফলতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপদেশ অনুসরণের দ্বারা সংশোধন করা না হয় তবে ভেবে দেখ আমাদের জীবনের পরিণতি কি হবে? অনেক সময় পর্যন্ত একপাশে ফেলে রাখা ফুটন্ত ডালের মতই আমাদের জীবনও দুর্গন্ধময় হয়ে উঠবে। একবার এক পিতা তার ছেলের কৃতিত্বের প্রশংসা করে সব শেষে বললেন, "তার দুটো মাত্র ছোট্ট দোষ আছে। তাহল (১) সে জানে না কি তার ত্রুটি, এবং (২) অপরে তার ত্রুটি ধরিয়ে দিলে সে তা গ্রাহ্য করে না।" এটা বহুদিন আগের ঘটনা। কিন্তু আজকে শুধুমাত্র একজন পুত্র নয়, প্রত্যেকেরই একই সংকটাবস্থা। পুত্র সম্পর্কে এই অভিযোগ করাটা প্রতিটি পিতার পক্ষেই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বিদ্যার অধিকারী বলে তারা দাবী করে থাকে সে বিদ্যার কি এই মূল্য?

কিন্তু শিশুরা স্বভাবতঃই নির্মল; দোষ হল যে ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় তার। অবশ্য, এ সত্য সকলেরই জানা আছে, কিন্তু প্রত্যেকেই তার সংস্কার সাধনে প্রচেষ্টা হতে নিজেকে সরিয়ে রাখে। এটাই হল প্রধান দুর্বলতা। লক্ষ লক্ষ উপায়ে উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু এদের একটিও রূপায়ণ তত সহজ নয়। "প্রাথমিক স্তর থেকে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত এই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে"—সংবাদপত্রে এই কথা ঘোষণা করা হয়ে থাকে, কিন্তু কাউকেই এই সংস্কার সাধনের চেষ্টা করতে দেখা যায় না, এমনকি, এর কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন, এবং কিভাবে তা করা দরকার, তাও কেউ দেখিয়ে দেয় না। শিক্ষাব্যবস্থার দোষগুলিকে কেউ তুলে ধরে না।

আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আচরণীয় মূল্যবোধ যে মনুষ্য কৃতিত্বের ভেতর সর্বপরি স্থান অধিকার করে আছে, সে সত্যকে উপলব্ধি করা হয় না। পদে যখন আসীন নয়, তখন তারা শিক্ষা বিষয়ে নানা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে থাকে বা মঞ্চ থেকে তোতা পাখির মত বলে যায়। একই ব্যক্তি ক্ষমতায় আসলে তারই আগের ঘোষণার বিপরীতমুখী কর্মপন্থা প্রণয়ন করে থাকে।

চুম্বক লোহাকে নিজের দিকে টেনে নেয়, কিন্তু ধূলো ঢাকা ও মরচে ধরা লোহার টুকরোকে আকর্ষণ করতে পারে না। অবশ্য মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেওয়া

ভালো, শুধুমাত্র তার দ্বারা অনুশীলন শক্তিহীন হয়ে যায়। এই রোগ থেকে মুক্ত না হলে শিক্ষা এবং প্রকৃত পাণ্ডিত্য তার প্রকৃত মূল্যকে প্রকাশ করতে পারে না। লোহার উপর থেকে ধূলো ও মরচের ভাগকে পরিস্কার করতে হবে, যাতে চুম্বক আকর্ষণ করতে পারে। এভাবে মনকে পরিস্কার চকচকে করে তুললে তা হয়ে দাঁড়াবে, কোন এক কবির বর্ণনায়, "একজন মহাত্মার পরিচায়ক চিহ্ন হল, এক চিন্তা, এক বাক্য, এক কর্ম"।

এই তিনটে সর্বদা এক থাকাটাই হল একজন লোকের উৎকর্ষতার প্রমাণ। এই অনুপম গুণকে মানুষ আজ তার নিজের ইচ্ছাতেই অস্বীকার করছে। কারণ তার শিক্ষণীয় আত্মবিদ্যা বা প্রকৃত বিদ্যা সম্পর্কে সে অবহিত নয়।

বহু বিদগ্ধ, পণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমকালীন ছিলেন। কিন্তু আত্মজ্ঞান তাদের আলোকিত করতে অসমর্থ হয়েছিল। তারফলে, ঐ সকল বিদগ্ধ, পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নাম আজকাল আর শোনা যায় না। কিন্তু যে রামকৃষ্ণ কোন পার্থিব বা বাহ্য বিষয়ক পাণ্ডিত্যের দাবি করতে পারতেন না, একমাত্র তাঁর নামই সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এর কারণ কি? সাধারণ জল এবং চিনি মিশ্রিত জল দেখতে একই রকম। পান কর! তাহলেই তুমি একটিকে সরবৎ ও অপরটিকে সাধারণ জল বলে চিনতে পারবে।

পরমহংসদেবের উক্তি গুলো ছিল পরম প্রাজ্ঞতা পূর্ণ। অপরাপর পণ্ডিতদের বক্তব্য ছিল পাঠ্য পুস্তকের উপর পাণ্ডিত্যে সম্পৃক্ত। কৃত্রিম পণ্ডিতগণ, যারা শুধুমাত্র বইয়ের পাতাই পাঠ করেছে, তারা অস্তিত্বহীনের পেছনেই ছোটে; তারা দিব্যত্বের অনুসরণ করে না। যেসব দেশলাই কাঠি জলে পড়ে গেছে, সেগুলো ঘষলে, যত জোরেই চেষ্টা কর না কেন, তাতে আগুন জ্বলবে না। তাছাড়া, ঐ কাঠিগুলো তাদের আধার বাক্সটিকেই নষ্ট করে দেবে। তেমনি বিষয়—বাসনা ও অভিসন্ধিতে সম্পৃক্ত হৃদয় থেকে তোতা পাখির মত উপদেশ বের হতে পারে, কিন্তু তাদের বড় জোর শ্রোতা থাকতে পারে, কোন অনুসারী তারা পাবে না; উপদেশ শুনবে কিন্তু গ্রহণ বা তদনুরূপ কাজ করবে না।

জগতের প্রতিটি ঘটনার সংঘটনের একটি বিশেষ কারণ থাকে, তা হল, জ্ঞান। অবশ্য জানবার কিছু না থাকলে জ্ঞানও থাকবে না। জ্ঞান আবার দু'ধরণের ঃ প্রকট ও প্রচ্ছন্ন, মুখ্য ও গৌণ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, প্রকৃত ও আপাত। প্রত্যক্ষ অথবা অ-পরোক্ষ (ব্যক্ত জ্ঞান) কর্ণ অথবা অন্যান্য ইন্দ্রিয় এবং অপরের

উক্তির মাধ্যমে লাভ হয়। পরোক্ষ (অথবা, প্রচ্ছন্ন) বা প্রকৃত জ্ঞান কোন বস্তুকে মানে না। যে আকর্ষণ বা যে বস্তু মনকে তাড়া করে, এই জ্ঞান তাকে বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করে। তা অন্তরের দৃষ্টিকে পবিত্র ও প্রসারিত করে তোলে।

তিন

আজকালকার শিক্ষাব্যবস্থা যদিও খুব ব্যয়বহুল ও বিস্তারিত, কিন্তু তা নৈতিক শিক্ষাকে অবহেলা করে থাকে। অতীতের গুরুকূলে সঠিক জীবনধারণ, আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ও নৈতিক আচার আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হত। তখনকার দিনে ছাত্রদের নম্রতা, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম অনুশীলন ও নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়ে জীবনযাপনের অভ্যাস করানো হত। আজকাল ঐসব গুণাবলী আর তাদের ভেতর লক্ষিত হয় না। তারা ইন্দ্রিয় দমনের উপায় ও তাৎপর্যকে জানে না। শিশুকাল থেকেই তারা প্রতিটি রুচি ও খেয়াল খুশিকে উপভোগ করে এসেছে; ইন্দ্রিয়ের অবাধ ব্যবহারে তারা আনন্দ পায় ও একমাত্র পার্থিব বিষয়ের উপরেই তাদের আস্থা রয়েছে। ফলস্বরূপ, কলেজ গুলোর অবস্থার দিকে তাকালে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠতে হয়। কলিকাতার স্বাস্থ্য অধিকর্তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ১০০ জনের ভেতর ৮০ জন ছাত্রেরই স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির কথা বলেছেন। বোম্বে অঞ্চলের অবস্থা আরও ভয়াবহ; সেখানকার সংখ্যা শতকরা ৯০ জন। এর কারণ হল, তারা ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের পেছনে অবাধ অনুসরণ এবং মন্দ আচরণপূর্ণ জীবনযাপনে আগ্রহী। একে কি শিক্ষা হতে অর্জিত সম্পদ বলে গণ্য করা যায় অথবা তাকে বিপথগামী অজ্ঞতার মাধ্যমে সঞ্চিত 'সম্পদ' বলা যায়? পাঠকগণ নিজেরাই এর উত্তর খুঁজে পেতে পারে।

শিক্ষকদের নিজ ভূমিকা ও দায়িত্বকে জানতে হবে। কোমলমতি ছাত্রদের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নতির অধিকাংশ দায়িত্ব তাদেরই বহন করতে হবে।

প্রত্যেক জীবই তাদের চারিপাশের জগতকে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই নিজস্ব বিশেষ দৃষ্টিতে আলাদা আলাদা ভাবে দেখে থাকে। একই জিনিসকে দশজন লোক দশ ভাবে প্রত্যক্ষ করে দশ রকম অনুভূতি পেয়ে থাকে। একটি লোককে তার ছেলে দেখে বাবা হিসেবে। স্ত্রী তাকে স্বামী রূপে গ্রহণ

করে। তার বাবা তাকে দেখেন পুত্র বলে। তার সঙ্গীর অনুভূতি হল যে সে তার খুব প্রিয় বন্ধু। একই ব্যক্তি হয়েও সে কেন সকলের ভেতর একই রকমের অনুভূতির সৃষ্টি করে না? যারা তাকে পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে তারা পৃথক অনুভূতি লাভ করে। এই হল সত্য।

ব্রহ্ম মঠে একবার এক গুরু যখন খোশ মেজাজে ছিলেন, আমেজের সঙ্গে পান চিবোতে চিবোতে, তিনি শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন "বৎস! জগৎটা কেমন?" শিষ্য উত্তর দিল, "গুরুজী! প্রত্যেকের জন্যে জগৎ হল নিজস্ব"। সকলে একই জগতে বাস করলেও প্রত্যেকেই নিজস্ব জগতে, নিজের কর্ম ও প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী গড়ে নেওয়া জগতে বাস করে। এ জন্যেই শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, "তোমাদের দৃষ্টিকে জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ কর, তাহলে তুমি যাই দেখবে তাই হবে ঈশ্বর"। দৃষ্টি যখন জ্ঞানে পূর্ণ, সৃষ্টি তখন ব্রহ্মে পূর্ণ।

আজকালকার শিক্ষার পরিভাষায় ধনই হল ধর্ম। অর্থের পশ্চাৎধাবন হল 'সঠিক' পথ। ধনই হল কর্ম। প্রতিটি কর্মের লক্ষ্য হল অর্থ লাভ। ধন হল সবচেয়ে মহান পদ। অর্থ লাভের চেয়ে অধিক আকাঙ্খিত আদর্শ আর নেই। নারায়ণের ষোলটি অভিব্যক্ত ভাব রয়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি হলেন অব্যক্ত সর্বব্যাপী সত্তা। তেমনি পার্থিব নারায়ণ, টাকার অংশ রূপে রয়েছে ষোলটি আনা। টাকাকে দৃশ্যমান ভগবান রূপে পূজো করলে নারায়ণ তাদের নাগালের বাইরে থেকে যান। এর ভেতর দিয়ে তাদের যে ক্ষতি হয় তা যে কত বিপুল তা কিন্তু কেউ খতিয়ে দেখে না।

উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প বলছি ঃ একদিন বিশ্রামালাপের সময় দিব্য সঙ্গিনী ধনের দেবী লক্ষ্মী, নারায়ণকে বললেন, "প্রভু! সমগ্র জগতই আমায় পূজো করছে। শতকরা একজনও, এমনকি, লক্ষে একজনও আপনাকে আরাধনা করে না।" এই বলে তিনি প্রভুকে ঠাট্টা করলেন। মানুষের আন্তরিকতাকে পরীক্ষা করবার জন্যে তিনি একটি পরিকল্পনা তৈরী করলেন। তিনি বললেন, "প্রভু! আমাদের নিজেদেরই আসল অবস্থাকে খুঁজে বের করা সবচেয়ে ভাল। আসুন আমরা দুজনেই মর্তে গিয়ে দেখে আসি।"

নারায়ণ রাজি হলেন। তিনি বিরাট পণ্ডিতের বেশ ধরলেন, নামকরা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চিহ্ন হিসেবে হাতে সোনার সব বালা পড়ে নিলেন। গলায় দিলেন রুদ্রাক্ষ মালা ও কপালে চওড়া বিভূতির

রেখা। জগতের সামনে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতরূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি গ্রামের পর গ্রাম ভ্রমণ করে তাঁর মনোমুগ্ধকর ভাষণ দিয়ে লোকেদের আনন্দ দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর দীপ্তিময় ব্যক্তিত্ব ও গভীর পাণ্ডিত্য লোকেদের আকৃষ্ট করল, হাজার হাজার লোক তাঁর কথা শুনতে এসে গ্রামের পর গ্রাম তাঁকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করল। ব্রাহ্মণগণ তাদের অঞ্চলে তাঁকে ডেকে নিয়ে সম্মানিত করল। নতুন কোন স্থানে তাঁর আগমন উৎসব হিসেবে বিরাট ভোজের মাধ্যমে পালিত হতে লাগল।

নারায়ণ যখন এভাবে সম্মানিত হচ্ছিলেন, লক্ষ্মীও পৃথিবীতে যোগিনী রূপে আবির্ভূত হলেন। তিনিও গ্রাম হতে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে লোকেদের আত্মা সম্পর্কে বোঝাতে লাগলেন। মহিলাগণ তাঁর ভাষণ শুনবার জন্যে বিরাট সংখ্যায় তরঙ্গের ন্যায় আসতে শুরু করল। তারা প্রার্থনা জানালো যে, তাদের গৃহকে ধন্য করবার জন্যে তাঁকে সেখানে পদার্পণ করে তাদের নিবেদিত আহার্য গ্রহণ করতে হবে। উত্তরে তিনি জানালেন যে, তাদের বাড়িতে যাবার অনুরোধকে গ্রহণ করবার পক্ষে তার কয়েকটি প্রতিজ্ঞা বাধ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাড়িতে যেসকল পাত্র একবার ব্যবহার করা হয়েছে সেসব পাত্রে তিনি আহার করবেন না। তিনি বললেন তাঁর নিজের পাত্র নিয়ে যাবার অনুমতি দিতে হবে। নিজেদের বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে মহিলাদের আগ্রহ এত গভীর ছিল যে, তারা ঐ শর্তেই রাজি হয়ে গেল। প্রতিটি স্থানের প্রতিটি মহিলার কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসতে শুরু করল।

প্রথম দিন যেখানে তাঁর আহার করবার কথা ছিল সেখানে যোগিণী গিয়ে উপস্থিত হলেন ও সঙ্গের থলে থেকে একটি সোনার থালা, কয়েকটি সোনার বাটি ও জলপান করবার জন্যে একটি সোনার ঘটি বের করলেন। বিভিন্ন রান্না পরিবেশন করবার জন্যে সেগুলোকে তাঁর সামনে সাজিয়ে রাখলেন। আহারের পর তিনি ঐসব দামি সোনার বাসনকে ফেলে রেখে চলে গেলেন গৃহকর্ত্রীকে নিয়ে নেবার জন্যে। তিনি বলে গেলেন যে, প্রতিদিনের জন্যে তার নতুন বাসনের সেট থাকে।

খবরটি ছড়িয়ে পড়ল। যে সকল গ্রামে নারায়ণ মনোমুগ্ধকর ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেসব স্থানেও যোগিণীর আশ্চর্যজনক দানের কথা পৌঁছে গেল। যে সকল ব্রাহ্মণ বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতের অনুগত গুণমুগ্ধ ছিল তারাও তাদের গৃহে যোগিণীকে

আমন্ত্রণ জানাতে ছুটলেন। যোগিণী তাদের বললেন যে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে গ্রামে পৌঁছুবার আগেই তাদের ঐ পণ্ডিতকে বের করে দিতে হবে। যে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি সেখানে থাকবে তিনি সেখানে পা পর্যন্ত ফেলবেন না। এবিষয়ে তিনি দৃঢ় সংকল্প। সোনার জন্যে লোকেদের লোভ এত বেশি ছিল যে এতকাল ধরে, এত জাঁকজমক করে যাকে তারা ভক্তি শ্রদ্ধা করছিল, তাকেই গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করল।

তারপর যোগিণী ব্রাহ্মণদের পল্লীতে প্রবেশ করলেন, ভাষণ দিলেন, তার সম্মানে আয়োজিত ভোজে অংশগ্রহণ করলেন এবং সোনার থালা বাটি প্রত্যেক গৃহকর্তাকে দান করলেন। যে সকল স্থানে পণ্ডিত স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করেছিলেন সেসব স্থান হতে যোগিণী এভাবে পণ্ডিতকে তাড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরিবর্তে তিনি সর্বত্র লোকেদের শ্রদ্ধা আদায় করলেন। সমস্ত জায়গা থেকে অপমান সহ্য করতে না পেরে পণ্ডিতের ভূমিকা ত্যাগ করে নারায়ণ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। যোগিণী একথা জানতে পারলেন। তিনিও তাঁর ভূমিকার অবসান ঘটিয়ে নিজ রূপ ধারণ করে প্রভু নারায়ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। নিজেদের ভেতর আলাপের সময় তিনি প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন বলুন! আপনার আবিষ্কার কি? আমাদের দুজনের ভিতর কে পৃথিবীতে বেশি সম্মানিত ও পূজিত?" নারায়ণ স্মিত হাসলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তুমি যা বলেছিলে তাই সত্যি।"

সত্যি, আজকাল যে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করা হয় তাকে বাজারের পণ্য করে তোলা হচ্ছে। প্রত্যেকের নিকট টাকাই সর্বস্ব। শিক্ষিত লোকেরা ভিক্ষাজীবির মত টাকার সন্ধানে তার মাতৃভূমিকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। এটা কি সঠিক শিক্ষার নমুনা?

চার

যে আধ্যাত্মিক নীতিবোধকে ভারত পোষণ করে থাকে তার প্রভাবে যে সকল দেশের লোকেদের উপর স্থায়ী শান্তি প্রদান ও সুখ বর্ধন করে আসছে। যে আদর্শের ভিত্তিতে এই দেশ কাজ করে যাচ্ছে তা হল "লোক সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু", "জগতের সকল লোক সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হোক।"

এই হল ভারতবাসীদের পরম লক্ষ্য। এই পবিত্র আদর্শকে পোষণ ও ফলপ্রসূ করবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন কালের সকল নৃপতি, ঋষি, ধর্মপ্রচারক পণ্ডিত, বিদগ্ধ, গৃহিণী ও মাতা প্রচুর ক্লেশ ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নিজেদের দৃঢ় প্রত্যয়কে ধারণ করবার জন্যে এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে নিজেদের জীবন রূপায়িত করবার সংগ্রামে তারা সম্মান ও যশকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিরল ও মূল্যবান বস্তুর বাহ্যিক সৌন্দর্য আকৃষ্ট করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক আলোক দ্বারা দীপ্ত চোখের নিকট তার মূল্য তুচ্ছ বলে মনে হবে। পার্থিব আকর্ষণ বা পার্থিব প্রভাব কখনই আত্মিক আকর্ষণ বা প্রভাবকে পরাভূত করতে পারে না। রজ গুণ অহংকারের উৎপাদক এবং যেখানে স্বার্থপরতা ও দম্ভ পরিদর্শিত হয় সেখানেই রজ গুণকে সনাক্ত করা যায়। এই চিন্তা ও কর্মধারাকে দমন না করা পর্যন্ত সত্ত গুণ প্রত্যক্ষ হতে পারে না, আর সাত্বিক গুণের অভাব হলে ঈশ্বর, শিব বা পরম শক্তি প্রসন্ন, তুষ্ট ও লভ্য হতে পারেন না।

হিমালয়াধিপতির দুহিতা পার্বতী ছিলেন দৈহিক রূপ লাবণ্যের পরকাষ্ঠা। তা সত্ত্বেও তাঁকে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সৌন্দর্যের গর্ববোধ ও সহজাত অহমিকার বিলোপ ঘটিয়ে সাত্বিক গুণ অর্জন করতে হয়েছিল। তাঁকে আত্মিক সৌন্দর্যে দীপ্ত হতে হয়েছিল! কথিত আছে, কাম দেবতা মদন, যিনি শুধুমাত্র পাবর্তীর যৌবনসুলভ রূপ লাবণ্যকে তুলে ধরে শিবের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, তিনি ভস্মীভূত হয়েছিলেন। ঐ ঘটনা এই সত্যেরই প্রতীক যে, অহংকারের আবর্তে আবদ্ধ থাকলে বিদ্যালাভ হতে পারে না। বিদ্যা দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করলে অহমিকা অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিন্তু আজকাল মনে করা হয় যে, আত্মশ্লাঘা ও অহমিকা প্রয়োজনীয় বিদ্যাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলে। বস্তু জগতের পাণ্ডিত্য একজনকে যে মোহিনী শক্তি প্রদান করে তা ত্যাগ করতে হবে। তাহলেই প্রকৃত সহজাত দিব্যত্ব নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে। আমাদের ভেতরকার অহংকার হল মদন, যা কিনা 'মনের উত্তেজনার স্রষ্টা,' এবং তাকে দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে ভস্মে রূপান্তরিত করতে হবে। ঈশ্বর কখনো দৈহিক লাবণ্য, পার্থিব কৃতিত্ব এবং শারীরিক, বৌদ্ধিক বা আর্থিক ক্ষমতার নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। এটাই হল মদন উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

পার্বতী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন এবং নিজেকে (অর্থাৎ তাঁর অহং বোধকে) রৌদ্র ও বৃষ্টি, শৈত্য ও ক্ষুধা সহ্য করিয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন। পরিশেষে ঈশ্বর (শিব) তাঁকে নিজের অর্ধাঙ্গিনী বলে গ্রহণ করেন! আধ্যাত্মিক অগ্রগতির এই স্তরকে বলা হয় সাযুজ্য (মিলন)। তাহল মোক্ষ ও মুক্তির তুল্য। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা হল সারল্য, বিনয়, সহিষ্ণুতা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুক্ত। তা ঔদ্ধত্য, বিদ্বেষ ও ঐ ধরণের দোষকে বিনষ্ট করে। এরূপ বিদ্যাই হল প্রকৃত আত্মবিদ্যা।

মোক্ষ বোঝায় মুক্তি। দেহ-পরিগ্রহণ যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সকল দেহী সত্তাই আন্তরিক ভাবে কামনা করে। সকল প্রাণীই হল বাধ্যতামূলক ভাবে মুমূক্ষু, অর্থাৎ মুক্তির আকাঙ্খী, বৈরাগ্যের অনুসারী। ত্যাগী হতে হবে। এই হল চরম সত্য, অবিসংবাদী সত্য। দেহ ত্যাগ করে চলে যাবার সময় কেউ এখান থেকে এক মুঠো মাটিও সঙ্গে নিয়ে যায় না। নিজ হতে কেউ বৈরাগ্য অনুশীলন না করলে প্রকৃতি তার মৃত্যুর ভেতর দিয়ে নিরাসক্তি ও ত্যাগের প্রয়োজন ও তাৎপর্যের মহান সত্য শিক্ষা দিয়ে থাকে। সুতরাং তা ঘটবার আগেই শিক্ষালাভ করা ভাল। যিনি এই সত্যকে জেনে অনুশীলন করেন তিনি প্রকৃতই ভাগ্যবান।

বৈরাগ্য হল বিদ্যা কর্তৃক বিদিত দ্বিতীয় মূল্যবান নৈতিক উৎকর্ষ। জলপূর্ণ পাত্রকে জলশূন্য করে দাও, পাত্রের ভেতর প্রতিবিম্ব বা ছায়া রূপে যে আকাশকে দেখা যেত তা জলের সঙ্গেই হারিয়ে যাবে। নিজ প্রকৃত আকাশ (ব্যেম) তখনই পাত্রে প্রবেশ করে। তেমনি যা কিছু অনাত্মা, তা পরিত্যাগ করলে আত্মা বর্তমান থাকে এবং মোক্ষলাভ ঘটে। কিন্তু যা পরিত্যাগ করতে হবে তা বস্তুগত প্রতিবন্ধকতা নয়, ত্যাগ হবে আত্মিক। অর্থ ও ভূমিদান, কিংবা যাগযজ্ঞ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান, অথবা গৃহ, স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করে বনে গমনকে অনেকে ত্যাগ বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ত্যাগ বলতে এ ধরণের দুর্বলচেতক কার্যকলাপ বোঝায় না। এসকল কাজকে যতটা কষ্টসাধ্য মনে হয় আসলে ততটা নয়। ইচ্ছা করলে তা সহজেই করা সম্ভব; যে কেউ এসকল কর্ম সম্পন্ন করে কর্মের নির্দেশানুযায়ী ত্যাগ করতে সক্ষম। **কিন্তু প্রকৃত ত্যাগ হল বাসনা পরিহার।**

এই হল ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রকৃত সমাপ্তি, তার সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য। বাসনা বর্জনের সঙ্গে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা ইত্যাদির পরিত্যাগও যুক্ত। মৌল ত্যাগ

হল বাসনা বর্জন। অন্যান্য সকল অনুভূতি ও আবেগ হল তার অনুগামী প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমরা বলি, 'কোদন্ড পানি' (যার হাতে রয়েছে কোদন্ড ধনুক), কিন্তু তা থেকে এটাও বোঝায় যে তার হাতে তীরও আছে। তেমনি বাসনা ইঙ্গিত করে কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উপস্থিতি। এগুলো বস্তুতঃই নরকের প্রবেশ দ্বার। বিদ্বেষ হল অর্গল ও অহংকার চাবি। চাবি দিয়ে তালা খুলে অর্গল তুলে নাও, তুমি প্রবেশ করতে পারবে।

মানুষের অর্জিত জ্ঞানকে ক্রোধ কলুষিত করে দেয়। অসংযত বাসনা তার সকল কাজকে নষ্ট করে দেবে। লোভ তার নিষ্ঠা ও ভক্তিকে ধ্বংস করবে। বাসনা, ক্রোধ ও লোভ মানুষের কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অবক্ষয় ঘটিয়ে তাকে অশিষ্ট ব্যক্তি রূপে গড়ে তুলবে। কিন্তু ক্রোধের মূল কারণ হল কাম এবং কাম হল অজ্ঞনতা প্রসূত। সুতরাং যা থেকে অব্যাহতি পেতে হবে তা হল অজ্ঞানতা।

অজ্ঞানতা হল পশুর বৈশিষ্ট্য। পশু কে? "পশ্যতি ইতি পশুঃ", "যে দর্শন করে সেই পশু"। অর্থাৎ যার বহির্মুখী দৃষ্টি রয়েছে এবং বাহ্যিক দর্শন যা জ্ঞাপন করে তার প্রতি যে আস্থাশীল, সেই হল পশু। অন্তরমুখী দৃষ্টি পরিচালনা করবে পশুপতির নিকট। ইন্দ্রিয়কে যে দমন করে নি সেই হল পশু। জন্মবধি পশুর নানা ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য থাকে। যত চেষ্টাই করুক না কেন তা সহজে পরিবর্তিত হয় না। তাদের হাত হতে পশু মুক্ত হতে পারে না। প্রদত্ত উপদেশের অর্থ উপলব্ধি করবার সামর্থ তার নেই। যেমন, আমরা একটি ব্যাঘ্র শাবককে লালন পালন করতে পারি, তাকে শান্ত ও বিশ্বস্ত হতে শিক্ষা দিতে পারি। কিন্তু ক্ষুধার্ত হলে সে শুধুমাত্র কাঁচা মাংস পছন্দ করবে, পুরী এবং আলু সে খাবে না। কিন্তু মানুষকে শ্রেষ্ঠতর পথে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব। তাই শাস্ত্রে আছে, "সকল প্রাণীর ভেতর মনুষ্য জন্ম হল দুর্লভ"। সত্যিই মানুষ সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান এবং সকল প্রাণীর ভেতর পবিত্র, কারণ সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে তার উন্নয়ণ সম্ভব। যে ব্যক্তি পশু হয়ে জন্মেছে সে নিজের চেষ্টা এবং শিক্ষায় নিজেকে পশুপতির স্তরে উন্নীত করতে পারে। পশু নিষ্ঠুর' হয়ে জন্মায় ও 'নিষ্ঠুর' থেকেই মারা যায়।

ইন্দ্রিয়কে দমন না করে অতিবাহিত যে জীবন তা মানুষ নামের উপযুক্ত নয়। মানুষ অনেক কর্মদক্ষতা দ্বারা বিভূষিত এবং তাদের সাহায্যে ইন্দ্রিয়কে বশে এনে যদি সঠিকভাবে পরিচালিত না করে, তবে অতিবাহিত বৎসরগুলোর শুধু

অপচয় হবে। ইন্দ্রিয়ের উপর এই প্রভুত্ব লাভে সফল হতে বিদ্যা সাহায্য করে থাকে। বিদ্যা বিনয় দান করে, শিক্ষা বিনয় বর্দ্ধন করে। বিনয়ের মাধ্যমে একজন বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত হবার অধিকার লাভ করে। সেই অধিকার সৌভাগ্য অর্পণ করে। সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি দানকর্মে ও ন্যায়সঙ্গত জীবনযাপনে সক্ষম। ন্যায়সঙ্গত জীবনযাপন ইহলোক ও পরলোকে সুখ নিশ্চিত করে।

পাঁচ

বিদ্যা অবশ্যই পরমাত্মা-তত্ত্বকে জানবার জন্যে প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক অন্বেষণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের নির্ধারণ ও গবেষণা করবে। ধর্মের নীতিসূত্র নির্দেশের মাধ্যমে নৈতিকতার প্রস্রবণকে প্রকাশ করে বিদ্যাকে অবশ্যই তার অকৃত্রিমতা প্রমাণ করতে হবে। বিদ্যা নিজেই হল নিজের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসের ভেতর তা হল মূল বিশ্বাস। মানুষকে ধর্মবিশ্বাস উপলব্ধি ও অনুসরণ করতে এবং জীবনধারাকে ঐ পথে চালিত করতে বিদ্যা সাহায্য করে। এর নাম দেয়া হয়েছে **দর্শনশাস্ত্র**।

দর্শনশাস্ত্র বলতে বোঝায় জ্ঞানলাভের আগ্রহ। জ্ঞান হল বিশাল সম্পদের ভাণ্ডার। জ্ঞানের মূল্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং বাধাবিপত্তি দ্বারা নিবৃত্ত না হয়ে নিরন্তর জ্ঞানের অনুসরণই হল বিদ্যা। বস্তু-কর্তৃক গৃহীত আকার ও উপস্থাপিত অবয়বের পটভূমি অনুসন্ধান করতে বিদ্যা চেষ্টা করে এবং একমাত্র ঐ আবিষ্কৃত সত্যই বস্তু সকলের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। সত্যকে জেনে তদনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে, সত্যকে দর্শন করতে হবে, এই হল বিদ্যার ধর্ম।

বিদ্যা হল প্রভা যা পূর্ণ এক জীবনে পরিব্যাপ্ত থাকে। পাশ্চাত্য দেশে ধারণা ও অনুমান নিয়ে বিদ্যা বেশী আলোচনা করে থাকে, প্রাচ্যে বিদ্যা অধিকতর মনোযোগী সত্য ও পূর্ণতার প্রতি। বিদ্যা কর্তৃক প্রার্থিত মৌলিক তত্ত্ব হল ইন্দ্রিয়াতীত। মানুষ হল দেহ, মন ও আত্মার ত্রয়াত্মক সংমিশ্রণ। ফলে তার সংগঠনে তিনটি প্রকৃতি বর্তমান থাকে ঃ (১) নীচ পাশবিক প্রকৃতি (২) মানবিক প্রকৃতি—জাগতিক জ্ঞান ও নৈপুণ্যে সম্পৃক্ত (৩) মানবের প্রকৃত প্রকৃতি অর্থাৎ দিব্য, আত্মিক প্রকৃতি। এই তৃতীয় স্তরকে জেনে নিজেকে সেই স্তরে প্রতিষ্ঠিত করাই হল বিদ্যা।

দেহ হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ উপাদানে গঠিত হয়। ঈশ্বর নিজে অদৃশ্য থেকে এই দেহ নিয়ে খেলা করছেন।

দেহ হল বৃক্ষবিশেষ, আত্মপ্রেম হল এর মূল; বাসনা হল তার শাখাপ্রশাখা; মৌলিক প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য ও আচরণবিধি হল তার পুষ্প, আনন্দ ও দুঃখ হল ঐ বৃক্ষপ্রদত্ত ফল।

মানবদেহ নিজেই একটি ব্রহ্মাণ্ড। রক্ত প্রবাহিত হয়ে দেহের প্রতিটি অংশকে সজীব করে রাখে। তেমনি ঈশ্বরও বিভিন্ন অংশে ও আদ্যন্ত প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্থানকে সক্রিয় করে রাখছেন।

একটি মাত্র আইন জগতকে পরিচালনা ও রক্ষা করছে, তা হল, প্রেমের আইন। প্রতিটি জাতি বা সম্প্রদায়ের, তার নিজস্ব কর্মধারা দ্বারা লব্ধ ও নির্ধারিত দুঃখ বা আনন্দ, ভাল বা মন্দ জীবন বর্তমান থাকে। 'মন্দ' হচ্ছে আসলে 'ভাল'র উল্টো দিক। আমাদের কি কি পরিহার করতে হবে তা 'মন্দ' শিক্ষা দেয়। চিরকালই তা 'মন্দ' থাকবে না, তা সদা ক্ষণস্থায়ী। 'ভাল' বা 'মন্দ' কোনটিই 'পরিপূর্ণ অপরিবর্তনীয়' অবস্থা নয়। 'ভাল' ও 'মন্দ' যে মনুষ্য মনের ভ্রান্তি ও আবেগপ্রসূত প্রতিক্রিয়ামাত্র তা বিদ্যা প্রকাশ ও পরিষ্কার করে দেয়।

একটি 'ভাল জিনিষ' ও অপর একটি জিনিষ, যা আমাদের কাছে 'অধিকতর ভাল' বলে মনে হয়, এদের ভেতর পার্থক্য বিচার করতে আমাদের সক্ষম হতে হবে। যদি কেউ তা করতে না পারে তবে প্রথম যে জিনিষটি তার কাছে ভাল বলে মনে হবে আর সব ছেড়ে দিয়ে তাকেই সে আঁকড়ে থাকবে। কিন্তু এটা বোঝা উচিৎ যে 'শ্রেষ্ঠতর' কখনও 'শ্রেষ্ঠ'র পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। যেমন 'অধর্ম' মানুষকে 'ধর্ম' অনুশীলন করতে এগিয়ে দেয়, তেমনি দুঃখ কষ্ট' মানুষকে সহানুভূতি ও দানধর্ম প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। সহানুভূতির অবশ্যম্ভাবী বীজ হিসেবে থাকে ক্লেশভোগ। যদি ভ্রম বা ক্লেশভোগ না থাকত তবে মানুষ হয়ে উঠত বৃক্ষকাণ্ড বা প্রস্তর মাত্র। জ্বালা যন্ত্রণার আহ্বানের মূল্যায়ন ও তাতে সাড়া দেবার সামর্থ্য যার নেই সে অন্ধ ব্যক্তির তুল্য। অন্ধ ব্যক্তি ভালকে মন্দ বলে গ্রহণ করে এবং মন্দকে ভাল বলে মর্য্যাদা দেয়। বিচারশূন্য ব্যক্তি একধরণের অবিচেতনাপ্রসূত আচরণে লিপ্ত থাকে।

কামনা জন্ম দেয় বাসনার। বাসনা জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। মানুষ যখন কামনাকে বর্জন করে তখন তার আর জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে যাবার প্রয়োজন

থাকে না। পরবর্তী জন্ম হল এ জীবনের অপরিতৃপ্ত বাসনার ফল এবং তদ্দারা নির্ধারিত। যাদের পার্থিব বস্তুর প্রতি বাসনা নেই তারা আত্মিক তত্ত্বের চেতনা লাভ করতে সক্ষম।

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে জানবার, ঈশ্বরকে ভালবাসবার, ঈশ্বরের প্রেম অর্জন করবার বাসনা, আবদ্ধকারী বাসনা নয়। এ ধরনের বাসনা পরম প্রজ্ঞা, পরাবিদ্যার, পবিত্র ইচ্ছার ফলশ্রুতি হিসেবে মানব অন্তরে উত্থিত হয়। ঈশ্বরচেতনা তার পূর্ণ দীপ্তি নিয়ে উদিত হলে সকল পার্থিব, ঐন্দ্রায়িক সাধনা ঐ চেতনার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। যে মুহূর্তে বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটে, ব্যষ্টিগত সত্তা বিশ্বজনীন সত্তার অভিমুখী হবে এবং পরমশান্তির ভেতর আনন্দ উপভোগ করবে। আত্মকে অনাত্মের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, যাতে সে অমরত্ব লাভ করতে পারে।

তোমার জীবনকে গঠন করবার ক্ষেত্রে তোমার চিন্তা এক অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এর জন্যই চিন্তার প্রতি নজর রাখতে এবং শুধু ভাল চিন্তাকেই স্বাগত জানাতে তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয়। মানুষ হল স্তূপীকৃত চিন্তা। মানুষের অন্তরে সৎ চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে বিদ্যা আত্মবিদ্যার স্তরে উন্নীত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি চেয়ার তোমার মনে একটি বিশেষ রূপ এবং একটি বিশেষ নাম সম্পর্কে ধারণার ইংগিত বহন করে। কিন্তু কাঠ সেই ধারণা ও সেই নাম ও রূপ উপস্থাপিত করে না। ঐ নাম ও রূপের মূল্য হল কাঠের প্রতি তুমি যে কার্যকারিতা আরোপ কর তার উপর নির্ভরশীল। তোমার সঙ্গে পার্থিব জগতের সম্পর্ক এমন হবে যাতে বাসনা তোমার কাছ হতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বাসনাকে আরও গভীর ও ব্যাপক করা নয়। মন থেকে বাসনাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

সত্যি কথা বলতে গেলে, জিনিষটির মর্য্যাদার জন্যে কেউ কোন জিনিষকে পছন্দ বা আকাঙ্ক্ষা করে না। সব সময়ই সে স্বার্থের কারণে নিজের প্রয়োজনে তাকে পছন্দ করে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষ সক্রিয়তাকে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু বিদ্যা হতে লব্ধ জ্ঞান প্রকাশ করে যে, যে অভিপ্রায় তাকে প্ররোচনা দেয় এমন কি তার জন্যেও ব্যক্তি পুরোপুরি দায়ী নয়।

কর্ম সম্পূর্ণভাবে কারও আয়ত্বাধীন নয়! একজনের কর্মই তাকে উন্নীত বা অবনমিত করে থাকে। জীবনকে দুর্বল ও নির্বাপিত করবার মত কতকগুলো

পদ্ধতির সঙ্গে মৃত্যু জড়িত। তা আত্মাকে প্রভাবিত করতে পারে না, আত্মার কোন মৃত্যু নেই। তাকে ধ্বংস করা যায় না। সুতরাং মৃত্যুকে ভয় পাওয়া উচিৎ নয়। মৃত্যু হল জীবনের অপর একটি স্তর মাত্র। রোগযন্ত্রণাভোগ যত দীর্ঘস্থায়ীই হোক না কেন, কিংবা যত তীব্র আঘাতে একজন আহত হোক না কেন, মৃত্যু একমাত্র তখনই ঘটতে পারে যখন সময় সঠিক কালের সংকেত দেবে। জীবন হচ্ছে সেই অবস্থা, যখন প্রাণ দীপ্তিময় হয় ও বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসে ওঠে। মৃত্যুর অবস্থা হচ্ছে যখন প্রাণ গর্জন ও বজ্রধ্বনি করে। জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা শেষ হলে জন্ম আর হতে পারে না।

একই অদ্বিতীয় শক্তি সকল হস্তকে ক্রিয়াশীল করে, সকল চক্ষুর মধ্য দিয়ে দর্শন করে, সকল কর্ণের মাধ্যমে শ্রবণ করে। আসলে সকল মানুষই এক দিব্য উপাদানে গঠিত। আমেরিকা বা চীন, আফ্রিকা বা ভারত সকল স্থানের মানুষের রয়েছে রক্ত, মাংস এবং অস্থির একই উপাদান। সহজাত আবেগ বা চেতনা সকল জীবের ক্ষেত্রেই এক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালাতে প্রস্তর, বৃক্ষ ও ধাতুর ভেতর যে প্রাণের চিহ্ন বর্তমান সে সত্যকে প্রদর্শন করা সম্ভব। আত্মাই হল দিব্যত্বের স্ফুলিঙ্গ। অনুসন্ধিৎসুগণ তার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। ঈশ্বর এক। অকলুষিত বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বর-বিশ্বাস জাগ্রত হয়। একজনের নাগরিকত্ব যাই হোক বা যে ধর্মই সে স্বীকার করুক না কেন, আধ্যাত্মিক অগ্রগতি বিষয়ক বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মবিদ্যা আয়ত্ব করলে সে অবশ্যই বিশ্বজনীন সত্তা বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হল মূল, কেন্দ্রবিন্দু। অপর সকল বিশ্বাস, ধারণা বা অনুমান বেষ্টনীর ন্যায় পরিধির উপর আবর্তন করে।

ছয়

প্রতিটি জীবী-সত্তার অপরিহার্য পরিণতি হল পূর্ণতা প্রাপ্তি। কোন প্রকারেই তাকে রদ বা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের বর্তমান অপূর্ণ অবস্থা হল পূর্ববর্তী জন্মসমূহের কৃতকার্যের পরিণাম। অর্থাৎ, অতীত জন্ম গুলোর চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ এবং কৃতকর্ম হল আমাদের বর্তমান অবস্থার কারণ। তেমনি আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্তমান কর্ম এবং বাসনা, চিন্তা ও অনুভূতির উপর নির্ভর করে

গঠিত হচ্ছে। অন্য ভাবে বললে, আমরা নিজেরাই হলাম আমাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণ। এর মানে এই নয় যে, সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্যে ও দুর্ভাগ্যকে এড়াবার জন্যে আমাদের অপর কারো সাহায্য গ্রহণ করা চলবে না। তা কেন? সম্ভবতঃ অতি অল্প কয়েকজনকে বাদ দিলে আর সকলের জন্যে এ ধরণের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। এই সাহায্য কেউ লাভ করলে তার শক্তি উন্নীত হয় পরম স্তরে, তার চেতনা বিশুদ্ধ ও মহান হয়ে ওঠে, এবং আধ্যাত্মিক প্রগতি হয় ত্বরান্বিত। পরিশেষে সে লাভ করে পরোৎকর্ষ ও পূর্ণত্ব।

পুস্তক পাঠের মাধ্যমে এই প্রাণবন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করা যায় না। একটি মনঃ-সত্তা অপর একটি মনঃ-সত্তার সংস্পর্শে এলেই তা অর্জন করা সম্ভব। সারাজীবন বই ঘেঁটে ঘেঁটে বুদ্ধিজীবী রূপে দক্ষতা লাভ হলেও আধ্যাত্মিক চর্চার এক পাও এগোতে পারা যায় না। যে ব্যক্তি বুদ্ধি বৃত্তিতে পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছে, তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছেন দাবী করা একান্তই অসঙ্গত। পাণ্ডিত্য ও কৃষ্টি কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা যুক্ত নয়। পার্থিব জ্ঞানে একজন যত পণ্ডিতই হোক না কেন তার মন যদি সংস্কৃতি সম্পন্ন না হয়, তাহলে তার সমস্ত জ্ঞানই আবর্জনা মাত্র। যে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং অর্জিত শিক্ষার ভিতর অনুপ্রবেশ দ্বারা তাকে বিশুদ্ধ করে তুলতে ঐ সংস্কৃতিকে সাহায্য করে থাকে, সেই শিক্ষাব্যবস্থাই হল সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ।

পুস্তক পাঠের ফলে, অর্থাৎ পার্থিব শিক্ষার মাধ্যমে একজনের বুদ্ধিমত্তা তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত হতে পারে। সে আবার আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপর চমৎকার ভাষণ দিতে পারে। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক জীবন আনুপাতিক হারে অগ্রসর হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে না। অপর কোন ব্যক্তি দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে রূপান্তরিত নাও করতে পারে। এর জন্যেই পরমার্থ বিষয়ে একনিষ্ঠ অনুশীলন ভিন্ন শিক্ষালাভ ফলহীন বলে প্রমাণিত হয়।

যে মহান ব্যক্তির হৃদয়ে আত্মিক সত্য অঙ্কিত রয়েছে, কেবলমাত্র তাঁকেই গুরু বলে স্বীকার করা উচিৎ। যে ব্যক্তি-বিশেষ এই আত্মিক সত্যকে সমাদর জানাতে এবং অবগত হতে ইচ্ছুক, শুধুমাত্র তাকেই ছাত্র বলে গ্রহণ করা যায়। বীজের ভেতর প্রাণ-তত্ত্বকে সুপ্ত থাকতে হবে। কর্ষণের মাধ্যমে জমিকে বপনের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। এ দুটো শর্ত পূর্ণ হলে আধ্যাত্মিক ফসলের প্রাচুর্যতা

লাভ হবে। শ্রোতার স্বচ্ছ ও গ্রাহী বুদ্ধিমত্তা থাকতে হবে, তা না হলে যে দার্শনিক তত্ত্ব হল জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ, তাকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে না। গুরু ও শিষ্য উভয়কেই এই স্তরের হতে হবে। অবশিষ্ট যাদের এ ধরণের গুণাবলীর অভাব রয়েছে তাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক জগতে শুধুমাত্র উদ্দেশ্যহীন ক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকা সম্ভব হতে পারে।

এ ধরণের সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান আচার্যদের চেয়েও অনেক উচ্চস্তরের ও গভীর যোগ্যতাসম্পন্ন গুরু রয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেন অবতার, নরদেহধারী ঈশ্বর। কেবলমাত্র সংকল্পের মাধ্যমেই তাঁরা আধ্যাত্মিক শক্তিরূপ করুণা বর্ষণ করে থাকেন। তাঁরা যে ক্ষমতা অর্পণ করেন তার প্রভাবে অতি নিম্নের চেয়ে নিম্নতম ব্যক্তিও সহজেই সিদ্ধপুরুষের স্তরে উন্নীত হতে পারে। অবতারগণ হলেন সকল গুরুর গুরু। তাঁরা হলেন মানব দেহে ঈশ্বরের সর্বোত্তম প্রকাশ।

মনুষ্য রূপ ভিন্ন অন্য কোন রূপের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরকে মনশ্চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান প্রকাশ করে যে, মানুষ নিজে যে সকল গুণাবলীর অভিজ্ঞতা লাভ করছে শুধুমাত্র সেই সব গুণের অধিকারী রূপে ঈশ্বরকে আরাধনা করা সম্ভবপর নয়। মানুষের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে ঈশ্বর মনুষ্য রূপে আবির্ভূত হন, কারণ মানুষ কেবলমাত্র ঐ রূপকে সত্য বলে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারে। ঈশ্বরকে চিত্রায়িত করে অন্য কোন রূপে তাঁকে কল্পনা করতে মানুষ যদি চেষ্টা করে, তবে তাকে অবশ্যই কোন বিকৃত, কিম্ভূতরূপে চিন্তা করতে হবে, এবং প্রকৃত তিনি হতে অনেক নিম্নমানের ঐ রূপকে সঠিক বলে বিশ্বাস করবার জন্যে প্রবল চেষ্টা তাকে করতে হবে।

একজন অন্য ব্যক্তি শিব মূর্তি তৈরী করতে রাজী হয়ে সে উদ্দেশ্যে বহু দিন ব্যয় করলেন। নিরলস শ্রমের মাধ্যমে সে অবশেষে এক বাঁদরের মূর্তি তৈরী করতে সক্ষম হলেন। যতদিন আমরা মানুষ হয়ে থাকব ততদিন মনুষ্য রূপ ভিন্ন অন্য কোন রূপ কল্পনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে চিত্রায়িত করতে পারব না। সুতরাং মনুষ্য প্রকৃতির উর্দ্ধে ও অতীত কোন স্তরে উন্নীত হয়ে ঈশ্বরের প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করবার সুযোগের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু জ্ঞান দ্বারা পরিবেশিত নয় এমন সাধারণ বিচার কর্তৃক পরিচালিত তুচ্ছ অনুসন্ধান কেবলমাত্র শূন্যগর্ভতাই উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করতে পারে। এ ধরণের লোক যখন অবতারদের নিন্দা করে বক্তৃতা দেয় তখন যদি

তোমরা উপস্থিত থেকে তা শুনতে পাও, তবে বক্তাকে জিজ্ঞেস করবে, "মাননীয় মহাশয় ! আপনি কি সর্বগত, সর্বশক্তিমত্তা, ও সর্বব্যাপিতা শব্দ গুলির অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন ?" যে বস্তু জগতের সঙ্গে মানুষ নিজ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংস্পর্শে আসে, শুধু মাত্র তার ভেতরই সে সীমাবদ্ধ। তাই এই সমস্ত ধারণাকে উপলব্ধি করবার পক্ষে সে অসহায়। এই সকল ধারণা সম্পর্কে বক্তা সাধারণ অশিক্ষিত লোকের চেয়ে বেশী কিছু জানে না। চিন্তার বিশাল দিগন্ত সম্বন্ধে নিজেরা পুরোপুরি অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও উপরে বর্ণিত বক্তাগণ তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে উত্তেজনা ও দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি করে থাকেন।

আসলে আধ্যাত্মিক শিক্ষা হল সত্যের অভিজ্ঞতা, সত্যের উপলব্ধি। প্রীতিপদ বাগ্মিতাকে সত্যের অভিজ্ঞতা বলে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা উচিৎ নয়। এই অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র নিজ অন্তরেই নিভৃততম পবিত্র স্থানে আসতে পারে। মানুষ যেভাবে সৃষ্ট, তাতে প্রকৃতিগত ভাবেই সে হল আবদ্ধ, সুতরাং সে ঈশ্বরকে মানুষ রূপেই দেখতে সক্ষম হয়। এর থেকে কোন পরিত্রাণ নেই। মহিষ যদি ঈশ্বরের আরাধনা করতে আকাঙ্ক্ষা করে, মহিষ-প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে ঈশ্বরকে বিরাট মহিষ রূপেই কল্পনা করতে পারে। তেমনি মানুষ দিব্যসত্তাকে মনুষ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মনুষ্য গুণসম্পন্ন বিরাট পুরুষ রূপে কল্পনা করে।

মানুষ, মহিষ, মাছ—এদের পাত্র বা আধারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কল্পনা কর যে, এই সকল পাত্র অনন্ত, দিব্য সাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নিজেদের তা দিয়ে পূর্ণ করতে। প্রত্যেকেই নিজ আকৃতি ও আয়তন অনুযায়ী তা পেতে পারে, তাই নয় কি? মনুষ্য পাত্র দিব্যত্বকে মনুষ্য রূপে লাভ ও স্বীকার করবে; মহিষ পাত্র পাবে মহিষের আকারে এবং মৎস্য পাত্র লাভ করবে মৎসাকৃতিতে। সমস্ত পাত্র-রূপই কিন্তু এক অভিন্ন দিব্য-সাগরে জলধারণ করে। মানুষ যখন ঈশ্বরকে মনশ্চক্ষুতে ধারণ করে তখন তাঁকে মানুষ রূপেই দর্শন করে। প্রত্যেকেই ঈশ্বরের উপর স্বীয় রূপ আরোপ করে থাকে।

সাত

মানুষ হল বীজের মত। বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়ে চারাগাছ, এবং তা থেকে ক্রমাগত বেড়ে গিয়ে বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনি মানুষকে উন্নত হয়ে পূর্ণতা

অর্জন করতে হয়। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে মানুষকে জ্ঞানের দুটো ক্ষেত্রকে আয়ত্ত করতে হয়। প্রথমটি হল, পার্থিব জ্ঞান, অর্থাৎ প্রকাশিত জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান। দ্বিতীয়টি হল অন্য জগৎ সম্পর্কীয় জ্ঞান। প্রথমটি শিক্ষা দেয় জীবিকা নির্বাহের উপায় (জীবন উপাধি), দ্বিতীয়টি নির্দেশ করে জীবনের লক্ষ্য (জীবন পরমাবধি)। জীবিকা নির্বাহের জ্ঞান সেই সব বস্তু এনে দেয় যা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। ঐসব বস্তু মানুষকে উপার্জন করে মজুত রাখতে হয় কিংবা প্রয়োজন মত তা জোগাড় করবার মত সামর্থ অর্জন করতে হয়। জীবনের লক্ষ্য বিষয়ক জ্ঞান যে সমস্যার জিজ্ঞাসায় নিযুক্ত তা হল ঃ 'কি উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করা উচিৎ?' "আমরা যা কিছুই জানছি তার স্রষ্টা কে?" "আমি—এই স্বতন্ত্র ব্যক্তি বিশেষ 'আমি' আসলে কে?"। এই, জিজ্ঞাসাই পরিশেষে লক্ষ্যকে প্রকাশ করে। সকল ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলি এবং সেইসব গ্রন্থ হতে প্রাপ্ত অনেক নৈতিক সূত্র জাগতিক সীমারেখার অতীত সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন, "আমরা এখানে কেন?" "এই জীবন যে সুযোগ এনে দিয়েছে তার উপযুক্ত হতে হলে আমাদের কি কি করতে হবে?" এবং "আমাদের কি হতে হবে?"।

এই জগতে বাস করবার জন্যে মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হিতকর পথ কি? এর উত্তর হল, নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মানুবর্তিত জীবনযাপন করা। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে এইসব বাধা নিষেধ মেনে চলবার মত তৈরী করে তোলে। পার্থিব জ্ঞান লাভ করবার জন্যে আমরা কত না কঠোর পরিশ্রম ও ক্লেশ ভোগ করি। দেহ সৌষ্ঠব বাড়াবার জন্যেও আমরা খুব যত্নের সঙ্গে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা অনুশীলন করি। সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই আমরা নীতি-নির্দেশ যথাযথ অনুসরণ করে যাই।

নিয়ন্ত্রিত চিন্তা ও আচরনের প্রকৃত ফল কি? গোড়ার দিকে নিয়ম, বিধিনিষেধ হল প্রাথমিক সাধারণ কাজ। ক্রমে এগুলো ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করে। তারপর, নিজ মনের নাগালের বাইরে, এমনকি, মনুষ্য দেহস্থিত সকল শক্তি দ্বারা অধিগম্যের সর্বশেষ প্রাচীরের বাইরেও সে পরিভ্রমণ করতে পারে। পরিশেষে, সকল সত্যের সত্যকে, অর্থাৎ সে নিজেই হল সকলের ভেতর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত তিনি, — এই তত্ত্বের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই বিশ্বাস ও চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে যায়। এই হল বিদ্যা, প্রকৃত বিদ্যালাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পদ্ধতির সারমর্ম। ঐ পদ্ধতিতে বিদ্যা

সমাজের আদর্শ স্থান, মানুষের সঙ্গে মানুষের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক, মনুষ্য জাতি, দেশ ও সম্প্রদায়ের ভেতর সর্বাপেক্ষা হিতকর যোগসূত্র, এবং দৈনন্দিন জীবনের শ্রেষ্ঠ আচরণ বিধি সম্পর্কেও প্রসঙ্গত শিক্ষা দিয়ে থাকে। মানুষের অগ্রগতির জন্যে যতটা গভীরে প্রয়োজন, মানব হৃদয়ের সেই গভীরতাতেই বিদ্যা এই বিষয়গুলিকে স্থাপন করে দেয়।

সকল বৃত্তির ভেতর শিক্ষকতা—বৃত্তিকেই সত্যের আদর্শে অনুরক্ত থাকতে হয়। শিক্ষকগণ যদি সত্যের পথ হতে বিচ্যুত হন তাহলে সমাজ বিপদের সম্মুখীন হয়। এ জগতের পথ ঘাট সম্পর্কে অপরিচিত হাজার হাজার কোমলমতি শিশু তাদের হাত হতে বেরিয়ে যায়। শিক্ষকদের দেওয়া শিক্ষা ও তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে হবে গভীর ও স্থায়ী। তাই শিক্ষকদের সকল প্রকার কুঅভ্যাস হতে মুক্ত হতে হবে। কারণ শিশুগণ আপনা হতেই বড়োদের অভ্যাস ও আচরণকে গ্রহণ করে নেয়। এটা হল সদা-বর্তমান বিপদ। এই অনিষ্টকর প্রভাব হাজার হাজার শিশুর ওপর বর্ষিত হলে সমাজ কলুষিত হয়ে যাবে। কালক্রমে ঐ সামাজিক দুষ্টতা উল্টে শিক্ষকদের ভেতরেও সংক্রামিত হয়ে যায়। "হে প্রভু! এই শিক্ষা আপনিই আমাকে দিয়েছিলেন"—এরূপ একটি গান আছে। একদিন শিক্ষককে তার নিজের ছাত্রদের কাছ থেকেই কলঙ্ক ও অবমাননা পেতে হবে। সুতরাং শিক্ষকদের নৈতিক উৎকর্ষতা দিয়েই নিজেদের সাজাতে হবে। কোন রাজা শুধু তার নিজের রাজত্বের ভেতরেই সম্মান লাভ করে থাকেন। রাজত্বের সীমানার ভেতরেই তিনি পূজিত। কিন্তু ধার্মিক পণ্ডিত ব্যক্তি সকল দেশেই সম্মানিত ও পূজিত।

একজনের হয়ত অতুলনীয় দেহসৌষ্ঠব থাকতে পারে, শক্তিশালী যৌবনের দীপ্তি থাকতে পারে, সে হয়ত উচ্চবংশে মর্যাদার গর্ব করতে পারে, লব্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিতও সে হতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট গুণাবলী যদি তার না থাকে তবে তাকে শুধু গন্ধবিহীন সুন্দর পুষ্পমাত্ররূপে গণ্য করা যায়।

ছোটবেলায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর মার সঙ্গে 'শ্রবণ ও তাঁর পিতামাতা' শীর্ষক এক নাটক দেখে স্থির করেন যে, তাঁকেও শ্রবণের মতো হতে হবে। হরিশচন্দ্র নাটক তাঁর মনে এমন গভীর রেখাপাত করে যে তিনি হরিশ্চন্দ্রের মতো সত্যের প্রতি সাহসী অনুরক্ত হতে স্থির সংকল্প হলেন। এগুলো তাঁর ভেতর এমন পরিবর্তন এনে দিয়েছিল যে তিনি অচিরেই একজন মহাত্মা পুরুষ হয়ে উঠলেন। স্কুল জীবনের গান্ধীজীর এক শিক্ষক ছিলেন, যিনি তাঁকে ভুল পথ

তারফলে তিনি
সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু গান্ধীজী তার শিক্ষা গ্রহণ করেন নি।
এ দেশে স্বরাজ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ভারত ভূমিতে হাজার হাজার
ভবিষ্যৎ মহাত্মা রয়েছে। ভারত ভূমিতে যে সমস্ত নরনারী আত্মবিদ্যা শিক্ষা ও
অনুশীলন করেছেন তাঁদের জীবনধারাকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মকে শুধুমাত্র ভারতীয়গণ নয়, সকল
দেশের মানুষই পরম মূল্যবান বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই সার্বজনীন সমাদরের
কারণ হল, তা বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। "বেদোঽখিল ধর্মমূলম"। বেদ হল সকল
নীতি সূত্র বা ধর্মের উৎস। ধর্ম বলতে বোঝায় সকল প্রাণী ও জীব সত্তার ভেতর
মানুষ যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে তা রক্ষা করবার জন্যে প্রয়োজনীয় কর্ম ও
দৃষ্টিভঙ্গী সকল নির্দেশনা। যে কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা, অধিকার ও দায়িত্ব মানুষকে
গ্রহণ ও জীবনে অনুসরণ করতে হবে, সেসব কিছু আধার বা ভাণ্ডার হল বেদ।

প্রাচীন গুরুকূলে, গুরুর কাছে শিক্ষা শেষ করবার পর শিষ্যের বিদায়কালে
গুরু তাকে এমন মহান উপদেশ দিতেন যা আর কোন দেশের কোন ছাত্র তার
শিক্ষকের কাছ থেকে পায় নি ঃ "মাতৃদেব ভব" (তোমার মাতাকে ঈশ্বরের ন্যায়
শ্রদ্ধা করবে), "পিতৃদেব ভব" (তোমার পিতাকে ঈশ্বরের ন্যায় সম্মান করবে),
"আচার্যদেব ভব" (তোমার শিক্ষককে ঈশ্বরের ন্যায় সম্মান করবে); সত্যং বদ
(সত্য কথা বলবে), "ধর্ম চর" (ধর্ম সম্মত পথে কাজ করবে), "ন ইতরানি" (অন্য
পথ অনুসরণ করবে না)।' এই ছিল আদেশ। "ধর্ম-সম্মত নয় এমন সব কাজ থেকে
বিরত হও। তোমার অগ্রগতির পরিপোষক, এমন কাজে শুধু নিজেকে নিযুক্ত
কর", এই ছিল উপদেশ। এইসকল অনুশাসন সম্পর্কে বেদ ও উপনিষদ তখনই
নির্দেশিত হয়ে থাকে যেখানে তারা "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" উচ্চারণ করে বিশ্বের
শান্তি নেমে আসবার জন্যে প্রার্থনা জানাতে বলে।

শিষ্যদের কাছে প্রদত্ত উপদেশের প্রতিটি অক্ষর হল পরম শক্তিধর। মাতা
পিতার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবার মাধ্যমে ধর্মব্যাধ শাশ্বত যশ অর্জন করেছিলেন।
সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র নিজেদের অমর করে
রেখেছেন। ধর্ম সম্মত আচরণের মাধ্যমে অতি সাধারণ মানুষ মহাপুরুষদের
স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। প্রাণীর ক্ষতি করা থেকে বুদ্ধদেব বিরত হয়েছিলেন।
তিনি অহিংসাকে "পরমোধর্মঃ" বলেছিলেন। তাই তিনি জগদ্‌গুরু বলে পূজিত
হয়েছিলেন।

প্রকৃত তপস্যা হল এইসকল নিয়মানুবর্তিতা ও বিধিনিষেধকে নির্দেশানুযায়ী পালন করা। মানুষের অন্তর্নিহিত তিনটি যন্ত্রের (ত্রি কারণ) ভেতর মন হল মুখ্য। মনকে এমনভাবেরক্ষা করতে হবে, তা যেন আসক্তি, কাম ও আবেগ প্রবেশ করতে না পারে। এইসকল চরম অনুভূতি মনের পক্ষে স্বাভাবিক। মনের উপর সৃষ্ট উত্তাল তরঙ্গ হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। এই ছয়টি হল মানুষের আন্তর শত্রু বা রিপু। প্রথম দুটো তাদের পেছনের বাকী চারটেকে নিয়ে আসে। প্রথম দুটো হতে মুক্ত হতে এবং তার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত হতে আমাদের সাধনার অভ্যাস করতে হবে। বিদ্যার মাধ্যমেই আমরা এই অভ্যাস সম্পর্কে জানতে পারি।

আট

ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা না রেখে অথবা ফলের প্রতি নির্বিকার থেকে শুধুমাত্র প্রেমের বশবর্তী হয়ে কিংবা কর্তব্যবোধের জন্য সম্পাদিত কর্মই হল যোগ। এই যোগ পশু-প্রকৃতি বিনষ্ট করে মানুষকে দৈবী সত্তায় রূপান্তরিত করে থাকে। অপরকে জ্ঞাতি-আত্মা স্বরূপ মনে করে সেবা কর। এ কাজ তোমার অগ্রগতিতে সাহায্য ও অর্জিত আধ্যাত্মিক স্তর হতে পতনের হাত থেকে রক্ষা করবে। এমনকি ব্রত ও পূজো থেকেও সেবা অনেক বেশী হিতকর। সেবা সুপ্ত স্বার্থপরতাকে নষ্ট ক'রে, হৃদয়কে উন্মুক্ত ও প্রস্ফুটিত করে।

তাই, কোন প্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে যে কাজ করা হয় তা হল সর্বাপেক্ষা আদর্শস্বরূপ, এবং তার উপর ভিত্তি করে নিষ্কাম সেবার সূক্ষ্ম প্রভাবের মাধ্যমে যিনি জীবনের প্রাসাদ তৈরী করেন, ধর্ম ও সদগুণ এসে তার চারপাশে মিলিত হয়। সেবা অবশ্যই হবে আন্তর সাধনার বাহ্যিক প্রকাশ এবং একজন যত বেশী সেবা করে যাবে, তার চেতনা তত বেশী প্রসারিত ও গভীর হতে থাকবে এবং তিনি আত্মিক সত্যকে অধিকতর স্বচ্ছ ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

সেবার আদর্শ এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হতে তা অনুশীলন করবার আকুতি, যার প্রধান অভিব্যক্তি হল শুদ্ধ প্রেম, তাই হল বিদ্যা। মানব জাতিকে প্রিয় সন্তানের মত যারা সেবা করে থাকেন, তাদেরই ঈশ্বর ভালবাসেন। স্বদেশবাসীদের

নিকট তারাই হলেন আদর্শ ভ্রাতা। এই সব ব্যক্তি আত্মিক চেতনা লাভের উপযুক্ত এবং তারা অচিরেই তা লাভ করে থাকেন।

নিজ সম্পদ, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও ভক্তিকে যিনি মানবজাতির কল্যাণে উৎসর্গ করেন তিনিই শ্রদ্ধালাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে, স্বার্থচিন্তা মুক্ত অকলুষিত সেবার পবিত্র সংকল্প পালনের জন্যেই তাঁরা জন্মগ্রহণ করে থাকেন।

অপরের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করবার আগ্রহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ সম্পদ, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও পদমর্যাদাকে যিনি উৎসর্গ করে থাকেন তিনি সত্যিই মহান হয়ে ওঠেন। এ ধরনের ব্যক্তি হলেন জগতের সদর্থক জিজ্ঞাসু। তিনি নিশ্চিতভাবে নিঃস্বার্থ সেবার সংকল্পকে পূর্ণ করতে সক্ষম হন। নিজ সহজাত কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে যিনি সচেতন এবং তা পূর্ণ করবার জন্যে জীবন যাপন করেন, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, সর্বদা পরম শান্তিতে বাস করেন। তার প্রভাবে প্রতিবেশীগণও ঐ শান্তির অংশীদার হয়ে থাকে।

যজ্ঞাগ্নিতে নিজ সংকীর্ণ অহংকে আহূতি দিয়ে, তার জায়গায় আধ্যাত্মিক বিজয়ের অট্টালিকার ভিত্তি স্বরূপ বিশ্বজনীন প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে বিদ্যা অনুপ্রাণিত করে থাকে। যে প্রেমের কোন সীমারেখা নেই তা মনকে বিশুদ্ধ ও নির্মল করে তোলে। সকল চিন্তা ঈশ্বরকে ঘিরে থাকুক, অনুভূতি ও আবেগ পবিত্র হোক, কর্ম ও তৎপরতা নিঃস্বার্থ সেবার অভিব্যক্তি হয়ে উঠুক। মন, হৃদয় ও হাত ভাল চিন্তা ও কাজ দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাক। সৎ পথে চালনা করবার এই কর্তব্যের দায়িত্ব বিদ্যাকে নিতে হবে। বিদ্যা প্রথমে সেবার রহস্যকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করবে। অপরের প্রতি সেবা যেন সর্বতোভাবে পূর্ণ আনন্দ বর্ষণ করে। বিদ্যাকে জোর দিয়ে বলতে হবে, সেবা করবার অজুহাতে যেন অপরের উপর কোন ক্ষতি, ব্যথা বা দুঃখ চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

নিজের তৃপ্তির জন্যে সেবা করা হচ্ছে—এই দৃষ্টিভঙ্গিই যেন তাকে সেবা করতে অনুপ্রাণিত করে। জীবনধারার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে সেবা করতে হবে। এই হল বিদ্যার প্রকৃত সারমর্ম। নির্মীয়মান বাড়ির জন্যে যেমন ইঁট, চুন, বালির প্রয়োজন তেমনি সেবার জন্য প্রয়োজন সেই ধরণের বিদ্যা যা চিন্তা, বাক্য ও কর্মকে বিশুদ্ধকরণের সংকল্পকে শক্তিশালী করবে। এইপ্রকার বিদ্যাই হল দেশের অগ্রগতির চাবিকাঠি।

মানবজাতির শান্তি ও সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করবার রহস্য কি? বিনিময়ে সেবা লাভের কোন প্রত্যাশা না রেখে অপরের সেবা করে যাওয়া। যে কর্ম আবদ্ধ করে তা হল দ্রুত বর্দ্ধমান বিরাট মহিরুহের মত। যে কুঠার তার মূলচ্ছেদ করতে পারে তা হল ঃ ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে আরাধনা হিসেবে প্রতিটি কর্ম সম্পাদন। এই হল প্রকৃত যজ্ঞ, সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় আচার। এই যজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্যা পোষণ ও অর্পণ করে। মনে রাখবে, সেবা করবার আকুল ইচ্ছা দেহের প্রতিটি স্নায়ুতে প্রবাহিত হতে হবে, প্রতিটি অস্থিতে পরিব্যাপ্ত হতে হবে এবং প্রতিটি কোষকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। আধ্যাত্মিক সাধনায় নিযুক্ত সকলকে সেবার প্রতি এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করতে হবে।

সেবা হল প্রেম বৃক্ষের পুষ্প, যে ফুল মানুষের মনকে ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ করে দেয়। অনিষ্টহীনতা হল তার সুগন্ধ। তোমার অতি সাধারণ কাজও দয়া ও শ্রদ্ধার সৌরভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক; নিশ্চিত জেনো, তাহলেই তোমার চরিত্র দীপ্ত হয়ে উঠবে। পরিতৃপ্তি হল পরম সুখ। যেখানে কোন নির্মমতা নেই সেখানেই পবিত্রতার সমৃদ্ধি ও ধর্মের বিকাশ ঘটে। লোভ যেখানে বর্তমান সেখানেই অধর্ম গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নিঃসঙ্গ বৃষের মত একাকী জীবনযাপন করবার প্রবণতাকে পুরোপুরি বিনষ্ট করে দিতে হবে। স্বপ্নেও এধরনের ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেবে না।

বিদ্যা প্রথমে নিজের কথা চিন্তা করবার জন্যে নির্দেশ দেয়। নিজেকে রূপান্তরিত ক'রে তবেই অন্যের পরিবর্তনের চেষ্টা করা যায়, এই উপদেশ বিদ্যা দিয়ে থাকে। পার্থিব জগতের প্রতি মোহময় আসক্তির মূলোৎপাটন শুধুমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা হিসেবে সম্পাদিত নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে সম্ভব। সকল মানবজাতির প্রতি প্রেম অপেক্ষা শুষ্ক স্বদেশভক্তি ও স্বদেশ প্রেমকে অনেক ছোট বলে মূল্যায়িত করতে হবে। প্রকৃত দেশভক্তি চিহ্নিত হয় সর্বদা, সর্বত্র, সকল দেশবাসীর প্রতি প্রেম ও সেবার দ্বারা।

তোমার কর্ম, তোমার আচরণ, তোমার দৃষ্টি, তোমার কথাবার্তা, তোমার খাদ্য, তোমার পোষাক, তোমার চলাফেরাই তোমার প্রকৃতির সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং সর্বদা নজর রাখবে যেন তোমার কথা, তোমার চলাফেরা, তোমার চিন্তা, তোমার আচরণ যেন সঠিক, প্রেমপূর্ণ ও সাত্ত্বিক এবং উগ্রতা ও একগুঁয়েমি মুক্ত হয়।

অপরের কাছ থেকে তোমার অনেক কিছু শেখবার আছে—তোমার আচরণে এ ধরণের বিনয়ের বিকাশ ঘটাতে হবে। তোমার উৎসাহ, তোমার উচ্চাভিলাষ, তোমার সংকল্প, তোমার কর্ম ক্ষমতা, তোমার জ্ঞানভাণ্ডার, তোমার বিজ্ঞতা—এসব কিছুকেই অপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, শুধুমাত্র তোমার একার জন্যে তা কাজে লাগালে চলবে না। তোমার হৃদয়ে অপর সকলকে টেনে নিতে হবে। তোমার চিন্তাধারাকেও এই প্রসারতার আদর্শে গঠন করতে হবে।

আহার হল একটি পবিত্র আচার, যা একটি যজ্ঞ স্বরূপ। উদ্বেগ ও আবেগময় উত্তেজনায় তা সম্পন্ন করা উচিত নয়। খাদ্যকে ক্ষুধারোগের ঔষধ ও জীবনের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে হবে। জীবনে যে সব বাধার সম্মুখীন হবে তার প্রত্যেকটিকে তোমার মানসিক শক্তিবৃদ্ধি ও অধিকতর সাহসী হবার জন্যে নিজেকে দৃঢ় করে তুলবার পক্ষে সাত্ত্বিক আহারই এক সৌভাগ্যসূচক সুযোগ বলে মনে করবে। প্রকৃতির স্বভাব হল "বিভিন্নতায় প্রকাশিত হওয়া" এবং দিব্যত্বের বৈশিষ্ট্য হল "একের ভেতর পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা"।

কাজেই যদি কেউ অপরকে অপছন্দ বা ঘৃণা করে কিংবা অপরকে হেয় অথবা নিন্দা করে তাহলে সে সত্যিই নির্বোধ, কারণ তার মাধ্যমে সে নিজেকেই হেয় এবং নিন্দা করছে! এই সত্য সম্পর্কে সে নিতান্তই অজ্ঞ। এই সত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং মৌলিক দিব্যত্বকে প্রকাশ করতে বিদ্যা মানুষকে উপদেশ দিয়ে থাকে।

অন্তরের বাগানে দিব্যত্বের গোলাপ, বিনয়ের জুঁই, উদারতার চাঁপা গাছ রোপন ও প্রতিপালন করতে হবে। প্রতিটি ছাত্রকে তার ঔষধের বাক্সে সর্বদা তৈরী রাখতে হবে—বিচারের বড়ি, আত্মসংযমের টনিক ও তিনটি পাউডার—বিশ্বাস, ভক্তি ও সহনশীলতা। এই ঔষধ ব্যবহার করে সে অজ্ঞতা নামক কঠিন রোগ হতে মুক্ত হতে পারবে।

জগতে অনেক বিনাশী শক্তি রয়েছে, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ পাশাপাশি সৃজনশীল শক্তিও বর্তমান। বিদ্যার প্রতি আগ্রহশীল ছাত্রদের বোমা ও মারণ যন্ত্রের পূজারী হওয়া উচিত নয়। নিজেদের মাধব ও মন্ত্রের সক্রিয় পূজকরূপে রূপান্তরিত করতে হবে। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হল এক শক্তিশালী মাদক। যতক্ষণ পর্যন্ত না এগুলো মানুষের মন থেকে পুরোপুরি বিনষ্ট হয়, এগুলো ততক্ষণ তাকে কলুষিত ও বিষাক্ত করে চলে। এসব দুর্ভাগ্যের জন্ম দেয়। কিন্তু বিদ্যা তাদের উপর পূর্ণতা ও সৌভাগ্য বর্ষণ করবে।

নয়

কোন জিনিস হতে লব্ধ উপকারের পরিমাণ হল ঐ জিনিসের উপর ন্যস্ত আমাদের আস্থার পরিমাপের সঙ্গে আনুপাতিক হারে নির্ভরশীল। ঈশ্বরের আরাধনা হতে, তীর্থস্থান দর্শন, মন্ত্র উচ্চারণ বা চিকিৎসকের কাছ থেকে আমরা কেবলমাত্র আমাদের বিশ্বাসের অনুপাতে ফললাভ করতে পারি। যখন কেউ ভাষণ দেন, পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে তার উপর আমাদের বিশ্বাস যত গভীর হবে তত পরিস্কার ও সরল ভাবে তার বক্তব্যকে আমাদের অন্তরে গ্রহণ করতে পারব। যা বিশ্বাস জন্মানো ও ধীশক্তিকে বাড়ানোর পক্ষে অপরিহার্য। প্রয়োজন হল মনের, যা হল চিন্তার ভিত্তিস্থল (ক্ষেত্র), চেতনার স্তর (চিত্ত), ও তার পবিত্রতা। কারণ পার্থিব ও ব্রহ্মাগত বিবিধত্বের ভেতর অবস্থান করে হঠাৎ স্বয়ম্ভু আত্মা স্ব-অন্বেষণ শুরু করে দিলে, ঐ প্রচেষ্টা হবে ফল হীন। কারণ তা আগ্রহী সংকল্প হতে উত্থিত হবে না।

প্রথমে চিত্তকে এই প্রপঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে আত্মচেতনার প্রতি চালনা করতে হবে। জমি ভাল ভাবে চাষ করে নিলেই তবেই বীজ তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হতে পারে তেমনি আত্মিক জ্ঞানে বা বিদ্যার বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে তখনি অঙ্কুরিত হতে পারবে যখন প্রয়োজনীয় সংস্কারের ভেতর দিয়ে তা তৈরী হয়ে থাকে।

শুধুমাত্র উপদেশ শুনে সন্তুষ্ট থেকো না। যা তুমি শুনছ, তা পরে চিন্তা করতে হবে, এবং এইভাবে যা অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যাবে, পরে তার অভিজ্ঞতা লাভ করতে এবং চিন্তা, বাক্য ও কর্মে প্রকাশ করতে হবে। শুধুমাত্র তা হলেই সত্য অন্তরের একটি সম্পদ রূপে হয়ে উঠতে পারে, তাহলেই সত্য তোমার ধমনীতে প্রবাহিত হতে, তোমার মাধ্যমে পূর্ণ দীপ্তিসহ মূর্ত হতে পারে।

বক্তৃতা ও ভাষণ শোনাটা আজকের দিনে এক ক্ষত, রোগ বা পাগলামোর স্তরে এসে পৌঁছেছে। একবার তা শুনে লোকে মনে করে যে সব তারা জেনে ফেলেছে। কিন্তু সত্য অন্বেষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল নিজেকে মুক্ত করা। আকাঙ্ক্ষাকে গভীর ও অধ্যাবসায়পূর্ণ হতে হবে। সত্যকে জানবার অভিজ্ঞতা লাভ করবার আগ্রহ তাহলেই হয়ে উঠবে যোগস্বরূপ, মহাশক্তির সঙ্গে মিলনের প্রক্রিয়া।

ধর্ম ও দিব্যত্বের ভিতরই হল যোগের মিলন। কাজেই লোভ ও ক্রোধ যত বেশী হতে থাকবে দিব্যত্ব তত কমে আসবে। অর্থাৎ এই কু-অভ্যাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার প্রতি বিশ্বাস কমে আসবে।

বিশ্বাস হল সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। স্ব-সত্তা বা আত্মার প্রতি বিশ্বাস হল প্রকৃত বিদ্যা। লোভ, ক্রোধ কমে বা অদৃশ্য হয়ে গেলে আত্মার প্রতি বিশ্বাস ও সঠিক আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা বেড়ে যাবে। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করবার জন্যে বৈরাগ্য হল ভিত্তিস্বরূপ। ছোট্ট একটি কাঠামোর জন্যে ভিত্তিকে স্থায়ী ও শক্ত করা প্রয়োজন, তা না হলে খুব শীঘ্রই তা গাদার মত পড়ে থাকবে। মালা তৈরী করতে হলে সূতো, ছুঁচ ও ফুলের দরকার হয়, তাই নয় কি? তেমনি জ্ঞান লাভ করতে হলে ভক্তি (সূতো), বৈরাগ্য (ছুঁচ) ও স্থির একাগ্রতা (ফুল) একান্ত প্রয়োজন।

জগতের সকলেই জয় লাভ করতে চায়। কেউ পরাজয়কে কামনা করে না। সকলেই সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করে, দারিদ্রকে কেউ চায় না। কিন্তু কিভাবে জয় অথবা সম্পদ অর্জন করা যায়? এ বিষয়টি চিন্তা এবং আবিষ্কার করতে হবে। সমাধানের জন্যে আমাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। মহাভারতে সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই রহস্য প্রকাশ করেছিলেন, "যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্ধর মহাবীর অর্জুন উভয়েই রয়েছেন, সেখানে জয় লাভ সুনিশ্চিত, রাজ্য লাভ সেখানে হয়ে গেছে।" এই উপদেশের চেয়ে বেশী কিছু আমাদের প্রয়োজন নেই। জয় লাভের জন্য শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিগত—এই তিন প্রকার সংগ্রামের প্রয়োজন নেই। হতাশা বা উৎকণ্ঠারও কোন কারণ নেই। ঈশ্বরের শরণাগত হও; সাহসের ধনুক হাতে নাও, অর্থাৎ, হৃদয়কে পবিত্র করে রাখ। তাহলেই যথেষ্ট। জয় ও ঐশ্বর্য লাভ তোমার হবে। কিন্তু যখন তুমি জয় ও ঐশ্বর্যের পেছনে ধাওয়া করবে তখন নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে তারা ছায়া মাত্র; অস্তিত্ব পূর্ণ বস্তু নয়। সূর্যকে পেছনে রেখে লক্ষ লক্ষ বৎসর পেছনে ছুটলেও তুমি কখনো তোমার ছায়াকে ধরতে পারবে না কারণ তা তোমার আগে আগে ছুটে যাবে। সব সময় নাগালের বাইরে থাকবে। সূর্যের দিকে ফিরে এগিয়ে যাও। তখন কি ঘটে লক্ষ কর। তোমার পথ দেখানোর পরিবর্তে তা তখন পিছনে পিছনে তোমায় অনুসরণ করবে। কৃতদাসের মত সে তখন তোমার পদচিহ্নের অনুগমন করবে। ছায়াকে মায়ার প্রতীক বলে মনে কর। যতক্ষণ মায়াকে অনুসরণ করবে, মাধবকে তখন অবহেলা করা হবে এবং তিনি দৃষ্টির বাইরে থাকবেন। তুমি তাঁর দর্শন পাবে না। তুমি জন্ম মৃত্যুর আবর্তে জড়িয়ে গিয়ে নিত্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। এই পরাধীনতার আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে

আসার চেষ্টা করতে হবে। তা না করে যদি কারো পুরো কর্ম প্রচেষ্টাই ইন্দ্রিয়সুখ লাভের দিকে চালিত হয়, তাহলে তা হবে নিতান্তই অজ্ঞতার পরিচায়ক।

যারা বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, তাদের উচিৎ প্রথমে নিজেদের মুক্ত করবার প্রচেষ্টায় তাদের সকল শক্তি ও দক্ষতাকে নিয়োগ করা। অন্য সব কিছু লাভ করবার জন্যে এটাই হল মূখ্য, বাকী সব কিছু হল সহায়ক। কিন্তু আজকাল লোকে মুখ্য ভিত্তিটিকে ভুলে সহায়কদের পিছনে ছুটে বেড়ায়। সব সময় তাদের মনে রাখা দরকার যে, তারা নিজেরাই হল আত্মা, বিভিন্ন সব যন্ত্রকে একত্রিত করে তৈরী করা দেহ তারা নয়।

এক রাজার পোষা একটি টিয়া পাখি ছিল। এর থাকবার জন্যে ছিল সোনার খাঁচা, খাবারের জন্যে সুমিষ্ট সব ফল দেওয়া হত। অমৃতের মত সব পানীয় দেওয়া হত তেষ্টা মেটাবার জন্যে। প্রতিদিন রানী নিজের হাতে দামী দামী সব খাবার তাকে খাওয়াতেন। খুব আদর করে হাত বুলিয়ে দিতেন। কিন্তু পাখিটি কি তার জীবনকে উপভোগ করত? মোটেই না। সব সময় তাকে বিমর্ষ দেখা যেত। এর কারণ কি? সোনার খাঁচা, সুমিষ্ট ফল বা পানীয়কে সে কোন আমলই দিত না, স্বয়ং রানী তাকে আদর করতেন বলে তার কোন গর্ব ছিল না। এসবের দিকে সে কোন নজরই দিত না। সে শুধু সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা করত, যে দিন সে শান্ত অরণ্যের সবুজ গাছের ডালে বসতে পারবে। তার দেহটা প্রাসাদের খাঁচায় খুব ভালভাবেই সময় কাটাচ্ছিল। কিন্তু তার মনে পড়ে ছিল সেই গভীর অরণ্যে, যেখান থেকে তাকে ধরে আনা হয়েছিল। অরণ্যেই সে জন্মেছে এবং সেখানে একটি গাছে সে বাস করত। টিয়াপাখিটি অনুভব করত যে রানী ও রাজার প্রাত্যহিক যত্ন, আদর, প্রশংসা, খাওয়ানো, তোষামোদের চেয়ে তুচ্ছ এক পাখি হয়ে নিজের পরিবেশে আপন সুখে স্বাধীনভাবে থাকা অনেক বেশী ভাল। মানুষ যদি শুধুমাত্র এই চেতনাকে লাভ করত যে, পার্থিব জগতে সে হল বিদেশী, তা হলে সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের আবাসভূমি অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে ব্যাকুল হয়ে উঠত।

রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে, দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে কোন কোন লোককে আটক করে বন্দী হিসেবে রাখা হয়। তাদের বড় বড় বাংলো দেওয়া হয়, তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী বিশেষ ভাবে পরিচর্যা করা হয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাদের স্তর অনুযায়ী আহার্য ইত্যাদি দেওয়া হয়। তাদের

বিলাসদ্রব্যও দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলোর চারধারে, বাগানের চারধারে, সবসময় পুলিশ পাহারা দেবে। সেখানে জীবনযাত্রার মান তার যাই হোক না কেন, যে সম্মানই তাকে দেখানো হোক না কেন, ব্যক্তিটি আসলে বন্দী। সে স্বাধীন লোক নয়। তেমনি এ জগতে এবং এ জগতের জীবনধারায় আবদ্ধ ব্যক্তি নানা প্রকার দামী আহার্য ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য ভোগ করতে পারলেও যেন সে গর্ববোধ না করে। প্রাপ্ত ইন্দ্রিয় সুখের দ্বারা যেন আনন্দিত না হয়। আত্মীয় ও বন্ধুদের জন্যে যেন অহংকার না করে। সে যেন এ সত্যকে সর্বদা উপলব্ধি ও স্মরণে রাখে যে, সে কারাগারে বাস করছে।

দশ

বিশ্বের সমস্যাগুলো বর্তমানে বিস্ময়কর রূপ ও বিশাল আকার ধারণ করেছে। এগুলো আর ব্যক্তিগত বা স্থানীয় সমস্যা নয়। তা এখন বিশ্বব্যাপী, সমগ্র মানবজাতি তাতে প্রভাবিত। একদিকে মহা জাগতিক গবেষণার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি লাভ করছে, অপরদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা; জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা, ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিভেদ, সংকীর্ণ আনুগত্য এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের ভেতর বিশৃঙ্খলার প্রকাশ দ্বারা মানবজাতি বার বার পীড়িত হচ্ছে। এগুলো বিশ্বের বিশৃঙ্খলা ও লাম্পট্য ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এ হল এক ভারসাম্যহীন ও পরস্পর বিরোধী অবস্থা। এর আসল কারণটি কি? মানুষের মনে ধর্ম ও নৈতিকতার যে বিরাট পতন ঘটেছে তার ভেতরই এর কারণ নিহিত। কিন্তু মানবজাতির আয়ত্বের ভেতর অনেক উপায় ও কৌশল রয়েছে যার মাধ্যমে সে জ্ঞান ও শক্তি অর্জন করতে পারে। বেদ এবং শাস্ত্র, ব্রহ্মসূত্র, বাইবেল, কোরান, জেনদ্‌আবেস্তা, গ্রন্থসাহেব এবং অন্যান্য হাজার হাজার পবিত্র গ্রন্থ থেকে যে অমূল্য উপদেশ লাভ করতে পারে। এ দেশ ভারতে মঠ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, আধ্যাত্মিক মতবাদ ও নিয়মানুবর্তিতার প্রবক্তা এবং পণ্ডিত ও শ্রদ্ধেয় বয়ঃজ্যেষ্ঠের অভাব নেই। তাঁরাও বিরাট আকারে প্রচার ও প্রকাশ করে চলেছেন। তা সত্ত্বেও জীবনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের মন ক্রমাগত ও দ্রুত অধঃপতিত হচ্ছে। এই পতনের কারণ কি?

অন্য সব সময়ের চেয়ে বর্তমানে মানুষ বেশী পাপাসক্ত হয়ে উঠেছে। আগের চেয়ে অনেক বেশী তারা নিজেদের নিষ্ঠুর কাজে নিয়োগ করছে। অপরকে দুঃখ কষ্ট দিয়ে মানুষ এতই আনন্দ পরিতৃপ্তি লাভ করে যে, ইতিহাস অনুযায়ী বিগত ৫৫০০ বছরে ১৫০০০টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এই ভয়াবহ আমোদ বিলাসের সমাপ্তি ঘটাবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। আসন্ন আনবিক যুদ্ধ হতে সমগ্র মানব জাতি নিশ্চিহ্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে। এ সমস্ত শঙ্কা ও ভয়ের সঠিক কারণ কি? এটা পরিষ্কার যে মানুষের ভিতর পশুত্ব এখনও প্রবল। একে দমন করা এখনও সম্ভব হয় নি। একমাত্র তা আয়ত্বাধীন করা সম্ভব হলেই আমরা, আমাদের দেশ ও পৃথিবী শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

বিদ্বেষ, ঈর্ষা, লোভ, জাঁকজমক প্রদর্শনের বাসনা এবং অপরের সঙ্গে তুলনা ও প্রতিযোগিতা—এই মন্দ লক্ষণগুলোর মূলোচ্ছেদ করছে তা নয়, এমন কি সাধু, সন্ন্যাসী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধ্যক্ষ ও পণ্ডিতদেরও প্রভাবিত করছে। এঁদের ভেতর ঈর্ষা ও লোভ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে উঠেছে। এই সব গুরু ও অধ্যক্ষ নিজেদের আদর্শস্বরূপ বলে জাহির করে থাকেন, তাঁরাও যদি এ ধরনের নীচ স্বভাবকে প্রদর্শন করেন তাহলে কি ভাবে তাঁরা জগতকে সঠিক পথে চালিত করতে পারবেন? তাঁরা শুধু কলুষিত অবস্থাকে আরও তীব্রতর করবেন।

আজকের পৃথিবীর জন্যে নতুন কোন মতবাদ, নতুন কোন শিক্ষা, নতুন কোন ব্যবস্থা, নতুন কোন সমাজ বা নতুন কোন ধর্মের প্রয়োজন নেই। এর প্রতিকার রয়েছে পবিত্রতায় পরিপূর্ণ মনে, হৃদয়ে। সর্বত্র যুবক, ছেলেমেয়ে ও শিশুদের অন্তরে পবিত্রতাকে দৃঢ়মূল ও বর্ধিষ্ণু করে তুলতে হবে। এই কার্যভারকে সাধনা হিসেবে গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তিদের নিযুক্ত হতে হবে।

একাজে সফলতা শুধুমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে সম্ভব। কিন্তু আজকের দিনে মানুষের কেবল উপার্জন ও সঞ্চয়ের উপর আস্থা রয়েছে। তারা ত্যাগ করতে ও অনাসক্ত হতে পারে না। সত্যের প্রতি তাদের কোন আস্থা নেই। মিথ্যাচার দ্বারা তারা আকৃষ্ট হয়, সত্যকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখতে পায়। তাই, মৃত্যু যে মহিমাময় জীবনের আনন্দময় পরিণতি, তা উপলব্ধি করতে তারা অসমর্থ। উদ্বেগ ও দুঃখের ভেতর তাদের মৃত্যু ঘটে। লোকে তোতা পাখীর মত সমানে

শান্তি, অহিংসা, ধর্ম ও প্রেম শব্দগুলি আওড়ে যায়। তারা ঘোষণা করে যে সত্যের চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, একটি মাত্র জিনিষের অধিকার লাভ করতে তারা চায় না, তা হল সত্য!

সব কিছুকে জানতে মানুষের আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু সত্যকে জানবার বাসনা তার মনে আসে না। সর্বোপরি স্ব-সত্তার সত্যকে জানবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা সে প্রদর্শন করে না। তার মনোযোগকে সেদিকে চালিত করে না। তা করলেও, তা শুধুমাত্র নিজের ভয় ও কুসংস্কারকে সমর্থন করবার জন্যে। সুতরাং নিজের দুর্বলতা ও অপরকে আঘাত দেবার প্রবণতাকে পরিত্যাগ করা মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য।

যা গোড়ায় কিংবা শেষে দেখা যায় নি, শুধুমাত্র মাঝখানে প্রকাশিত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে সত্য হতে পারে না। তা হল মিথ্যা, সত্য নয়। উত্থিত হবার আগে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ছিল না, ডুবে যাওয়ার অর্থাৎ প্রলয়ের পরে তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মধ্যবর্তী কালে যা প্রকাশিত হয়, তা আপাতঃ সত্য, ক্ষণস্থায়ী, সীমিত সত্য হতে পারে। তা কখনও অক্ষয়, অব্যয় সত্য হতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুর মূল্য ও বৈধতা সম্পর্কে অনুসন্ধান এভাবেই করতে হবে। যেমন, জন্মের আগে দেহ ছিল না, মৃত্যুর পর তা এখানে থাকবে না। তেমনি মাটির পাত্র, ঐ রূপ ও নাম নিয়ে পাত্রটি কিছুকাল অবস্থান করে আবার মাটির রূপে ফিরে যায়। 'পাত্র' মাটি মাত্র, কৃত্রিম উপায়ে তার উপর একটি নাম ও রূপ আরোপ করা হয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তুই হোক না কেন, তা কঠোরভাবে কালের প্রভাবাধীন; অবশ্যই মৃত্যু ও ধ্বংসের মুখোমুখী হতে হবে। বৃক্ষ ও মাটি, গৃহ ও দেহ, রাজা ও রাজত্ব—প্রত্যেককেই এই পরিসমাপ্তি ভোগ করতে হবে। নিজের অমরত্বকে উপলব্ধি করার উপায়কে মানুষ দূরে সরিয়ে রাখে। অনিত্য মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত জ্ঞান সম্পর্কে সে পাগল হয়ে ওঠে। এই সাধারণ প্রলোভন দ্বারা বশীভূত লোকেরা হল সেই ধরণের, যারা স্বর্গের নন্দনকানন ছেড়ে বিষাক্ত সব গাছগাছড়ার অরণ্যে ছুটে আসে। তারা মৌলিক (বিম্ব) হতে, আত্মা হতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তারা ছায়া (প্রতিবিম্ব) দ্বারা, সুস্পষ্ট দৃশ্য দ্বারা বিমোহিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে শুধু নিজেকে নির্বোধ বলে ঘোষণা করছে, সত্য-প্রাজ্ঞ ও সত্য-জিজ্ঞাসু বলে নয়।

মানুষের মনে রাখা উচিৎ, যে, ত্রিলোক, ত্রিকাল ও ত্রি-চেতনাবস্থা (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) থেকে এক কণাও প্রকৃত সুখ লাভ করা যায় না। মানুষের ভেতর কেবলমাত্র নির্বোধ ব্যক্তিরাই পার্থিব কর্মের মাধ্যমে লব্ধ সীমিত, কৃত্রিম সুখ দ্বারা নিজেদের পরিতৃপ্ত করতে চায়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভালভাবেই সব জানেন। যারা সুমিষ্ট আঙ্গুরের ঝোপ ছেড়ে কাঁটাগাছের ঝোপের দিকে ছুটে যায় তারা হল 'উট'। তাদের অন্য কোন প্রজাতি বলে চিহ্নিত করা যায় না।

পাহাড়ের চূড়ো দূর থেকেই মনোহর, কাছে এগিয়ে গেলে ভীতিজনক অরণ্যের সম্মুখীন হতে হয়। তেমনি যতক্ষণ মানুষ সংসারের অর্থ ও মূল্য নিয়ে অনুসন্ধান না করে ততক্ষণ তা মনোরম বলে মনে হয়। তার মূল্যায়নে বিচারবুদ্ধিকে প্রয়োগ করলেই এ সত্য প্রকাশিত হয়ে যায় যে, পরিবাররূপ অরণ্য বা পৃথিবীরূপ অরণ্য প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। যতক্ষণ মরীচিকা রূপে মনোরম হয়ে থাকে ততক্ষণ কি হ্রদ তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ? অবিদ্যমান জলরেখার কাছে সে ছুটে যেতে সমর্থ—এই বিশ্বাস নিয়ে, নিজেকে প্রতারণা করে, কেউ ধাবিত হলে সে শুধু আরও বেশী তৃষ্ণার্ত হবে। তার আর কোন লাভ হতে পারে না।

সুতরাং, আত্মবিদ্যা শিক্ষা করা উচিত, যার মাধ্যমে একজন নিজের আত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। তা জেনে, তদনুযায়ী জীবন যাপন করে, সে তার নিজের তৃষ্ণা ও সকল মানব জাতির তৃষ্ণা মেটাতে পারে।

এগার

মানুষকে তার জীবদ্দশায় অনেক কিছু অর্জন করতে হবে। এগুলোর ভেতর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হল ঈশ্বরের করুণা, ঈশ্বরের প্রেম লাভ। ঈশ্বরের প্রেম তাকে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি বা আন্তর শান্তি লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করবে। দেবত্বের আসল প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার জন্যে মানুষকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অবশ্য মানুষ তার চেষ্টার গোড়াতেই অব্যক্ত অদ্বিতীয় সত্তার তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। প্রথমে একটি রূপ ও কিছু গুণাবলী আরোপ করে তবেই তাঁকে নাগালের ভেতর আনতে পারবে। তারপর ধাপে ধাপে একে দিব্যশক্তির অবরোহণরূপে নিজের ভেতর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে চেষ্টা

চালাতে হবে (শক্তি পথ)। এই প্রচেষ্টায় সফলতা লাভের জন্যে নিযুক্ত সাধককে কিন্তু শুধুমাত্র এই পথের অনুসারী হলে চলবে না। তাকে সেবার মনোভাব অনুশীলন করতে এবং এমন সব সৎ কাজে নিযুক্ত হতে হবে, যা অপর সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম। কেবলমাত্র এভাবেই সে তার চিত্তকে নির্মল করতে এবং আধ্যাত্মিক জয়লাভের জন্যে প্রার্থী হবার উপযুক্ত হতে পারবে।

সন্ন্যাস বলতে বোঝায় চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রম গ্রহণ ও তার ইতিকর্তব্য পালন, সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে অরণ্য বাস এবং ঋষিসুলভ কৃচ্ছ্র সাধন বোঝায় না। সন্ন্যাসীদের অবশ্যই জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের সুখদুঃখ সম্পর্কে অবহিত হতে এবং তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা দিতে হবে। এই কর্তব্য সন্ন্যাসীদের পালন করতে হবে।

সন্ন্যাসীদের মাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাছ জলের ভেতর চলাফেরা করে, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মাছ জলের পোকা এবং পোকার ডিম খেয়ে জলকে পরিষ্কার করে দেয়। তেমনি সন্ন্যাসীদেরও নানা জায়গায় সর্বদা ঘুরে বেড়াতে হবে। তাঁদের কর্তব্য হল নিজেদের জীবনের উদাহরণ ও শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকে কলুষতা মুক্ত করা। উপদেশের মাধ্যমে সমাজকে পাপ ও অন্যায় হতে রক্ষা করা।

গাছ তাদের শাখা প্রশাখাকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তার করতে পারে। কিন্তু শেকড়ে জল দিলে তবেই শাখা-প্রশাখা পল্লবিত হয়ে ফুল ফলে পূর্ণ হতে পারে। তা না করে যদি ঐ শাখা প্রশাখায়, ফলে ও ফুলে জল দাও, তবে কি গাছ বেঁচে থাকতে বা বড় হতে পারবে? সমাজের সৌভাগ্য ও শান্তির মূল হল ভক্তি ও নিষ্ঠা। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার কর্তব্য হল এ দুটো গুণের বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা। যে সব লোক কর্তৃত্ব করবার মত উচ্চপদে আসীন রয়েছে, তাদের অধিকারী বলা হয়। কিন্তু এই শব্দটি আবার 'অধিক-অরি'—বড় শত্রুও বোঝাতে পারে। প্রকৃত অধিকারীকে সতর্কতার সঙ্গে, এই পথকে পরিহার করতে হবে এবং নিজের পদমর্যাদাকে নিজ অধীনস্থদের সেবায় ব্যবহার করতে হবে।

অতীতকালে, কোন অঞ্চলের লোকেদের কখনও ভয় বা উদ্দেশ্যের কারণ ঘটলে অথবা তাদের আনন্দ ও সন্তোষের উৎস শুকিয়ে গেলে, ঐ দুর্দৈব অবস্থার কারণস্বরূপ এলাকার মন্দিরের দেবপূজায়. কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি হয়েছে বলে

ধরে নেওয়া হত। আন্তর শান্তি লাভের জন্যে ঐ ত্রুটিকে খুঁজে বের করে শোধরাবার ব্যবস্থা করা হত। এ ভাবেই ঐ সংকটকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। এই ধরণের কাজকে আজকাল বস্তাবন্দী করে 'কুসংস্কার' আখ্যা দিয়ে এক পাশে ফেলে রাখা হয়। কিন্তু তা মোটেই কুসংস্কার নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের স্বল্পতা এতই করুণ যে, তারা এ ধরণের বিশেষ সমস্যাকে বুঝতে পারে না। এই হল আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রাথমিক স্তর।

প্রাচীনগণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরম সত্যের বৈধতাকে উপলব্ধি করেছিলেন। আধুনিকগণ অবশ্য তাদের ঐ আবিষ্কারকে নস্যাৎ করে দেয়। তথাকথিত সভ্য সমাজে বর্বরতা ছড়িয়ে যাবার এই হল কারণ। অনেকেই এই সত্যকে জানতে পারে নি। প্রত্যেক জীবই সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, দুঃখকে কেউ চায় না। কেউ কেউ ধনসম্পদের লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাদের ধারণা সোনা তাদের সুখ দিতে পারবে। কেউ কেউ বিলাস দ্রব্য সঞ্চয় করেন, কেউ বা গাড়ী ঘোড়া সংগ্রহ করে। যে জিনিস তাকে আনন্দ দিতে সক্ষম বলে সে বিশ্বাস করে প্রত্যেকেই তা পাবার জন্যে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কোথা হতে সুখ লাভ সম্ভব এটা অতি অল্প সংখ্যক লোকই জানে। তিন রকমের সুখ আছে ঃ এক ধরণের সুখ গোড়াতে বিষবৎ মনে হলেও পরে অমৃতে রূপান্তরিত হয়। এই সুখ আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে লাভ হয়; এটি হল সাত্বিক সুখ অর্থাৎ শম, দম, ইত্যাদি যেসব প্রাথমিক সাধনার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় তা কঠিন ও অপ্রীতিকর বলে বোধহয়। তারজন্যে সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তাই প্রতিক্রিয়া তিক্ত হতে পারে। 'যোগ বশিষ্ঠতে' বশিষ্ঠদেব বলেছেন, "হে! রাম! অসীম সমুদ্রকে মানুষ অতি সহজেই পান করে ফেলতে পারে। বিশাল সুমেরু পর্বতকে অল্প আয়াসেই মানুষ পৃথিবীর উপর থেকে উপড়ে ফেলতে পারে। ব্যাপক অগ্নিকান্ডের লেলিহান শিখা সহজেই গিলে ফেলতে পারে। কিন্তু মনকে সংযত করা এগুলোর চেয়েও অনেক বেশী কঠিন।" সুতরাং মনকে কেউ দমন করতে সফল হলে সে আত্মপোলব্ধি লাভ করে। এই সফলতা শুধুমাত্র বহু পরীক্ষা ও নিবৃত্তির মাধ্যমে সম্ভব। পরিশেষে একজন যে ব্রহ্মানন্দ লাভ করে থাকে, তা হল প্রথম ধরণের সুখ। সকল সাধনার ফলস্বরূপ তিনি নির্বিকল্প সমাধির পূর্ণ সমত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং যে আনন্দ তিনি লাভ করেন তা হল অবর্ণনীয়। তা হল

অমৃত, অমরত্বের সুধার তুল্য। নির্বিকল্প বলতে সেই চেতনা বোঝায় যা হল সকল চিন্তারহিত। উপযুক্ত সাধনার মাধ্যমে সেই স্তর লাভ করা যায়। আবার তা হল দু'ধরণের ঃ সমগ্র অভিজ্ঞতায় অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈত ভাবনার অবসান হলেই আসে অদ্বৈতভাব। প্রথমটি মানুষকে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান—এই ত্রয়ীর অতীত স্তরে নিয়ে যায় এবং সে শুধুমাত্র মহা জাগতিক জ্ঞান বা ব্রহ্ম সম্পর্কে সচেতন (এই হল অদ্বৈত ভাবনা)। দ্বিতীয় স্তর তখনি লাভ হয় যখন ঈশ্বর ও মানুষের উপর আরোপিত সকল গুণই সমগ্র ব্রহ্মান্ড ও তার সকল আধেয়র পরিগ্রহণকারী সেই এদের উপলব্ধিতে লীন হয়ে যায় (এই হল অদ্বৈত-স্থায়ী বা অদ্বৈত-অবস্থা)।

দ্বিতীয় প্রকারের সুখ হল ঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়র উপর বাহ্য বস্তুর প্রভাববশতঃ অমৃতবৎ রূপে ভ্রান্তিপ্রদ সুখের উৎপত্তি হয়। কালক্রমে ঐ সুখ তিক্ত ও অপ্রীতিকর বিষে পরিবর্তিত হয়। এই হল রাজসিক সুখ। রাজসিক এই ইন্দ্রিয় সুখকে স্বাগত জানালে মানুষের শক্তি, চেতনা, বুদ্ধি এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ নামক মনুষ্য প্রচেষ্টার চারটি লক্ষ্যে উপনীত হবার উৎসাহ দুর্বল হয়ে যায়, কারণ তার আগ্রহ স্থিমিত হয়ে আসে।

তৃতীয় প্রকারের সুখ হল তামসিক। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তা বুদ্ধিকে স্থূল করে দেয়। তা নিদ্রা, অলসতা এবং ত্রুটিতে পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়, এবং এগুলো থেকে সুখ লাভ করে। আত্মপোলব্ধির পথকে তামসিক ব্যক্তি উপেক্ষা করে, সারাজীবনে এই পথের প্রতি কোন নজর দেয় না।

সুতরাং যে বিদ্যা মানুষের মন ও বুদ্ধিকে সাত্বিক সুখ লাভের প্রতি পরিচালনা ও নির্দেশনা দেয় তাই হল প্রকৃত বিদ্যা। অবশ্য, শুধুমাত্র অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা লাভ করা সম্ভব। শাস্ত্রে আছে, “সুখের মাধ্যমে সুখ লাভ সম্ভব নয়” (ন সুখাৎ লভ্যতে সুখং)। কেবলমাত্র কষ্ট ভোগের মাধ্যমেই সুখকে জয় করা সম্ভব। বিদ্যার মাধ্যমে এই সত্যকে অন্তরে প্রবেশ করাতে হবে। সাত্বিক সুখ দ্বারা প্রদত্ত আনন্দকে একবার জানতে পারলে বিদ্যাকেও সহজ ও প্রীতিকর মনে হবে।

মনুষ্য জন্ম যখন লাভ হয়েছে তখন পার্থিব বস্তুকেন্দ্রীক বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এই অমৃত বিদ্যাকে লাভ করবার উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করতে হবে, কারণ একমাত্র অমৃত বিদ্যাই আত্মাকে প্রকাশ করতে এবং আত্মানন্দের অভিজ্ঞতা লাভে মানুষকে সাহায্য করতে পারে।

বারো

'বিদ্' ধাতুর সঙ্গে 'য' যুক্ত হয়ে বিদ্যা শব্দের উৎপত্তি। 'য' বলতে বোঝায় 'যাহা' এবং 'বিদ্' হল 'আলোক'। অর্থাৎ 'যা আলোক প্রদান করে' তাই হল বিদ্যা। সুতরাং এটা পরিস্কার হচ্ছে যে, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাই বিদ্যা নামে পরিচিত হবার উপযুক্ত। প্রাচীনকালে জ্ঞানকে আলোক এবং অজ্ঞানকে অন্ধকার রূপে দেখা হত। ঠিক যেমন আলোক ও অন্ধকার একই সময়ে একই স্থানে একত্রে থাকতে পারে না তেমনি বিদ্যা ও অবিদ্যা একত্রে থাকতে পারে না। সুতরাং অগ্রগতির পথে যাত্রীদের অর্থাৎ সাধকদের কর্তব্য হল চেতনাকে নির্মল করার ও ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা নিজেদের আলোকিত করা।

বিভূতিযোগ অধ্যায়ে গীতা আমাদের বলেন, "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং"। ভগবান বলছেন, "আমি হলাম সকল বিদ্যার ভেতর অধ্যাত্মবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা)।" আর সব বিদ্যা হল নদনদী, অধ্যাত্মবিদ্যা হল সাগর। সকল নদনদী সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। তেমনি সকল বিদ্যা তাদের চরম লক্ষ্য হিসেবে অধ্যাত্মবিদ্যার সঙ্গে মিলিত হয়। শুধু তাই নয়। সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হলে নদী নিজের পৃথক নাম ও রূপকে হারিয়ে সমুদ্রের নাম ও রূপকে গ্রহণ করে। তেমনি পার্থিব বাহ্য বিদ্যা গুলো ব্রহ্মবিদ্যার বিশাল মহাসমুদ্রে এসে মিলিত হলে নিজেদের বিশেষ নাম ও রূপকে ত্যাগ করে থাকে।

"বিদ্যা তপোভ্যাম পূতাত্মা"—বিদ্যা ও তপস্যার দ্বারা মানুষ শুদ্ধ আত্মায় রূপান্তরিত হয়। বিদ্যার দুটো বিশেষ দিক আছে বলে ধরা যেতে পারে ঃ বাহ্যবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা। বাহ্যবিদ্যা মানুষের জীবিকা অর্জনের রসদ জোগায়। মানুষ অনেক বিষয়ে পাঠ করতে পারে, বহু মূল্যবান ডিগ্রি লাভ করতে পারে, উচ্চ হতে উচ্চতর চাকরি যোগাড় করতে পারে এবং নিরুদ্বেগ, নির্ভয় জীবন যাপন করতে পারে। এই বিদ্যার মাধ্যমে মানুষ চাপরাশি হতে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যে কোন পদ লাভ করতে পারে। অপরদিকে ব্রহ্মবিদ্যা নিজের প্রতি তার দায়িত্বকে সফলতার সঙ্গে পালন করবার মত শক্তি সকল মানুষের উপর সমান ভাবে বর্ষণ করে থাকে। পার্থিব জীবনের আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের ব্রহ্মানন্দ, এই উভয়কে লাভ করবার পথ নির্দেশ তা দিয়ে থাকে। তাই এ জগতে মানুষের নিকট লভ্য সকল বিদ্যার ভেতর ব্রহ্মবিদ্যা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ব্রহ্মবিদ্যা

হল প্রত্যেকে বন্ধন হতে মুক্তি দেবার মত দিব্য ক্ষমতার অধিকারী, বাহ্য বিদ্যার তেমন কোন ক্ষমতা নেই। ব্রহ্মবিদ্যা সর্বশক্তিমান, পরম সত্তা, পরব্রহ্ম সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করে; তপস্যা তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে তোমায় সাহায্য করে। বিদ্যা হল জ্ঞান লাভের উপায়, তপস্যা হল জ্ঞেয়। প্রথমটি হল পরোক্ষ, তা হল পথ। দ্বিতীয়টি হল লক্ষ্য, পরিণতি।

গুরু শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'বড়', 'মহান' লোক। অর্থাৎ, গুরুকে বিদ্যা ও তপস্যা এ দুটোই আয়ত্ত করতে হবে। জামাকাপড়ের ভেতর জমে থাকা নোংরাকে ধুয়ে ফেলতে চাইলে সাবান ও পরিষ্কার জল উভয়েরই প্রয়োজন। তেমনি অন্তরে যে মলিনতা জমে আছে তাকে সরাতে আগ্রহী হলে বিদ্যা ও তপস্যা উভয়েরই অবশ্য প্রয়োজন। একমাত্র ও দুটোর ব্যবহারের ফলেই চেতনার স্তর পুরোপুরি নির্মল হবে। দুটো চাকা না থাকলে কোন গাড়ী চলতে পারে না; একটি ডানার সাহায্যে পাখী উড়তে পারে না। তেমনি বিদ্যা ও তপস্যা ছাড়া কোন মানুষ পবিত্র বা নির্মল হতে পারে না।

তপস্যা বলতে নিজেকে উলটে নিয়ে বাদুড়ের মত মাথা মাটিতে পা উপরে তোলা বোঝায় না। আবার তা পার্থিব সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ, দেহকে কৃশ তৈরী করা, নাক চেপে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করাও বোঝায় না। না। দৈহিক ক্রিয়া, উক্তি ও মানসিক সংকল্প, এ তিনটের ভেতর ঐকতান আনতে হবে। চিন্তা, বাক্য ও কর্ম এ তিনটিকেই বিশুদ্ধ হতে হবে। এই হল আসল তপস্যা। কর্তব্যের বাধ্যবাধকতায় এ তিনটের সমন্বয় সাধন করলে চলবে না। অন্তরের আকুতি ও নিজের আনন্দের জন্যই প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করতে হবে। এই সংগ্রাম হল তপস্যার সার।

গীতা আদর্শ গুরু ও আদর্শ শিষ্যের বর্ণনা দিয়েছেন—শিষ্য হলেন অধিকারমূর্তি এবং গুরু হচ্ছেন অবতারমূর্তি। অর্জুন শিক্ষালাভের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন, কৃষ্ণ মানবজাতিকে শিক্ষাদানের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। ছাত্র হল নরোত্তম, শিক্ষক হলেন পুরুষোত্তম। শিষ্য নিয়ন্ত্রণ করেন ধনুককে, গুরু সকল দক্ষতার গূঢ় রহস্য যোগকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি হলেন যোগেশ্বর। অর্জুন হলেন ধনুর্ধারী। এই উভয়ের মিলন হতে বিদ্যা হয়ে দাঁড়ায় ব্রহ্মবিদ্যা।

শ্রীকৃষ্ণের সকল শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করে ছাত্র অর্জুন বললেন, "করিষ্যে বচনং তব"—"আমি আপনার আদেশ পালন করব"! এখন আর তিনি তাঁর ধনুক

গাণ্ডীবকে ফেলে দিচ্ছেন না, যে অহংকার তাঁকে মোহগ্রস্ত করেছিল, তাকেই এখন ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। গুরু ছিলেন সূত্রধারী —নাট্য পরিচালক। শিষ্য অর্জুন হলেন পাত্রধারী—নাটকের চরিত্র। দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বলে শিষ্যের গর্ববোধ করা উচিৎ নয়, কারণ যতক্ষণ তোমার আত্মশ্লাঘা থাকবে, তুমি কোন গুরুকে পাবে না। গুরু তোমাকে স্বীকার করলে তোমার অহংকারও দূরে চলে যাবে।

সর্বস্ব দান করে দিয়ে নিজেকে মহান বলে ভাবা কিংবা বৈরাগ্যের অহংকার করা উচিৎ নয়। প্রকৃত বৈরাগ্য হল নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। গুরু তখন তোমায় নিজের ইচ্ছেমত চলবার স্বাধীনতা দেবেন, যেমন কৃষ্ণ করেছিলেন। "প্রিয় অর্জুন! যথেচ্ছসি তথা কুরু—তোমার যেমন ইচ্ছে হবে তাই কর। ভাল করে ভেবে নাও। এবং যা তোমার পছন্দ তেমনি কাজ কর", কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন। তিনি বোঝাতে চাইলেন যে প্রয়োজনীয় সব রকম উপদেশ তিনি দিয়েছেন, অর্জুনের পরিত্যক্ত অহমিকাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং নিজের ইচ্ছেমত কাজ করবার স্বাধীনতা অর্জুনকে দেয়া যেতে পারে কারণ অর্জুনের ইচ্ছা এখন তাঁরই ইচ্ছায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঐ স্তরে উন্নীত ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিতে হবে। শিষ্য নিজেকে এবং তার সব কিছুকে সমর্পণ করেছে বলেই নির্দয়ভাবে তাকে আদেশ করে যাওয়া গুরুর উচিত নয়। লোভী গুরু ও অলস শিষ্য, এরা উভয়েই অধঃপাতে যায়। গুরু অবশ্যই বিত্তাপহারী অর্থাৎ বিত্ত-চোর হবে না, তাকে হতে হবে হৃদয়াপহারী চিত্ত-চোর! গুরুকে এলার্ম দেওয়া ঘড়ির মত হতে হবে। যারা অজ্ঞানের নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তাদের ডেকে তুলতে হবে এবং আত্মজ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে পুরস্কৃত করতে হবে।

কোন এক পথিক গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যাবার সময় বন্যাপ্লাবিত এক নদীর সম্মুখীন হল। জল ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল ও এগিয়ে আসছিল। সে অসহায় বোধ করছিল, কারণ কিভাবে নদী পার হওয়া যাবে তা বুঝতে পারছিল না। চারদিক তাকিয়ে দেখল। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার থেকে অল্প দূরে একটি গাছের নীচে দুজন লোককে বসে থাকতে দেখল। তাদের কাছে গিয়ে সে দেখতে পেল যে একজন হল অন্ধ, অপরজন খোঁড়া। তার মনে হল যে কোথায় নদী গভীর ও কোথায় অগভীর এখবর এদের কেউ জানে না। তাদের কোন কিছু জিজ্ঞেস না করেই সে ফিরে এল। সে জানত যে এদের উত্তরের ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়া সমীচীন হবে না।

প্রাচীন মুনি ঋষিদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার স্বরূপ শাস্ত্রকে যে গুরু আয়ত্ত করেনি সে এই গল্পে অন্ধ ব্যক্তিরূপে বর্ণিত হয়েছে। লব্ধ জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করেনি---এমন ব্যক্তির প্রতিভূ হল খোঁড়া লোকটি। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রজ্ঞান ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা---এ দুটো একত্রে একটি পূর্ণ মানুষ গড়ে তোলে। কেবলমাত্র এ ধরণের গুরুই তার শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিষ্যকে রক্ষা করতে পারে। মুণ্ডকোপনিষদে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে।

ভাল শিষ্য পাওয়ার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ সদগুরু লাভ। একমাত্র প্রকৃত গুরু আশ্রয় দিলেই শিষ্য আদর্শ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে। শুদ্ধ-চিত্ত শিষ্য, নিঃস্বার্থ শিষ্য, নিরহংকারী শিষ্য---এ ধরণের শিষ্য যদি গুরুর কাছে আসে তাহলে গুরু দিব্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। রাজা পরিক্ষিৎ সর্বস্ব ত্যাগ করে ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্যে স্থির সংকল্প হলেন, সেই মুহূর্তেই মহর্ষি শুকদেব তাঁকে সরাসরি লক্ষ্যে নিয়ে যাবার জন্যে আবির্ভূত হলেন। তেমনি ভাল শিষ্যের সদগুরু লাভ হলে শুধু তাঁরা নিজেরাই ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন না, সমগ্র বিশ্বে শান্তি, সৌভাগ্য ও আনন্দ বর্ষণ করতে তাঁরা সক্ষম হন।

তেরো

শিক্ষার্থীগণ! প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে কালাতীত, মায়াতীত ও তমসাতীত পুরুষকে জানতে হবে। শাশ্বত ব্রহ্মানন্দের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ। তোমরা হচ্ছ প্রভুর প্রিয়তম সন্তান। বায়ুর ন্যায় তোমরা বিশুদ্ধ ও পবিত্র। নিজেদের পাপী বলে নিন্দা করো না। তোমরা সিংহশাবক, মেষশাবক নও। তোমরা অমরত্বের তরঙ্গবিশেষ, পদার্থের মিশ্রণের মাধ্যমে লব্ধ বস্তু নও। তোমাদের সেবা ও আদেশ পালন করবার জন্যে সকল পার্থিব বস্তু রয়েছে, তাদের সেবা ও আদেশ পালন করা তোমাদের কর্তব্য নয়।

এটা মনে করো না যে, বেদ কতকগুলো ভয়াবহ নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ বেঁধে দিয়েছে। নিয়ামক ঈশ্বর কর্তৃক এবং নিয়মকানুনের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি পদার্থ, প্রতিটি অণু তাঁর নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছে। একথাই বেদ আমাদের বলে থাকে। এরূপ ঈশ্বরের সেবা করবার চেয়ে উত্তম ও

মঙ্গলজনক আরাধনা আর কিছু হতে পারে না। বিশ্বচরাচরের ভেতর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমের জন্যে যে প্রেম একজন পোষণ করে, তার পরিমাণের চেয়েও বেশী প্রেম তাঁকে নিবেদন করতে হবে। এক এবং অদ্বিতীয়রূপে তাঁকে ভালবাসতে হবে। এই প্রেমের সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার ফল তাই হওয়া উচিত।

পদ্মপাতা জলের নীচে জন্মায়, জলের উপর ভেসে বেড়ায়, কিন্তু ভিজে যায় না। তেমনিভাবে মানুষকে সংসারে থাকতে হবে—সংসারে, সংসার দ্বারা, সংসারের জন্য, কিন্তু সংসারের নয়। এই ভূমিকা পালনের জন্যে তোমায় তৈরী করাটাই হল উচ্চতর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

অর্থাৎ, হৃদয়কে ঈশ্বরে মগ্ন রেখে, হাতকে কাজে ব্যস্ত রেখে এই সংসারে বাস করতে হবে। প্রেমকে দেনা-পাওনার বস্তুতে নামিয়ে নিয়ে আসাটা ঠিক নয়। প্রেমের ভেতরই প্রেম তার পূর্ণতা লাভ করে। বিবাদ বিসংবাদের ভেতর কোন বিশেষ মতবাদ বা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হিন্দুধর্ম চায় না; অভিজ্ঞতায় কষ্টি পাথরে সকল মতবাদ বা তত্ত্বের মূল্যায়ন করতে চায়।

কোন গাছের মূল্য তার ফল দিয়ে যাচাই করা হয়। আচরণবিধি, আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও প্রেমের অভিব্যক্তি,—এ সবকিছুর ভেতরই মানুষের প্রগতির পক্ষে সহায়ক গুণাবলী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যামান।

ভারতের মহান ব্যক্তি ও আধ্যাত্মিক আচার্যদের মতে মানুষ কখনো অসত্য থেকে সত্যের দিকে এগিয়ে যায় না, তারা যায় আংশিক সত্য হতে পূর্ণ সত্য অভিমুখে। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র আত্মাকে গরুড় পাখি বলা যেতে পারে। গরুড় ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হয় এবং অতি প্রাকৃত শক্তি অর্জন করে অসীম দীপ্তি ও মহিমার অধিকারী হয়ে সৌর বলয়ে উপনীত হয়।

সৃষ্টির মৌলিক সত্য হল বিবিধত্বের ভেতর একত্ব। ভারতবাসীগণ তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অন্য সব ধর্ম কতকগুলো নির্দিষ্ট তত্বকে গ্রহণ করে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে অনুশাসন স্থির করেছেন। তাঁরা এ ধরণের ধর্মীয় গোষ্ঠী তৈরী করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। যে অনুভূতি ও আবেগকে বৈধ ও মূল্যবান বলে তাঁরা স্থির করেছিলেন সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই পূজো, প্রার্থনা ও উপাসনা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে গিয়েছেন। মানবজাতির যে উপকার প্রতিটি ধর্ম করে থাকে তা হল মানবচেতনাকে পার্থিব জগতের গন্ডির বাইরে

প্রসারিত করা ও তার অন্তর্নিহিত দিব্য স্ফুলিঙ্গকে প্রদীপ্ত করে দেওয়া। স্বতন্ত্র নানা পরিবেশ ও অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্যে বিভিন্ন রূপ ও গুণের ভিতর দিয়ে সেই এক ও অদ্বিতীয় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। এই ভাবনা হল ভারতীয় উপসনা পদ্ধতির ভিত্তি। সুতরাং ঈশ্বর বর্তমান আছেন ও প্রতিটি ধর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ঠিক লাভ করা যায়—এই ঘোষণা করবার মত জ্ঞানগর্ভ সহনশীলতা পৃথিবীর সকল লোকেদের ভেতর শুধুমাত্র ভারতীয়দেরই রয়েছে। এই হল তাদের অনবদ্য সৌভাগ্য।

জীবনধারণের মৌলিক নীতিগুলোর অন্যতম হল পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে কুণ্ঠিত না হওয়া। প্রাচীন ইতিহাস যত বেশী পাঠ করবে, ঐসকল যুগের মানুষদের অবস্থা যত বেশী উপলব্ধি করবে, তোমার ভেতর গর্ববোধ তত বেশী বেড়ে যাবে। তোমার পূর্বপুরুষদের পরম অবদানের প্রতি বিশ্বাস তোমার ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে রক্তকে তেজস্বী করুক। সেই বিশ্বাসের প্রভাব তোমার দেহ, মন ও জীবনী শক্তিকে সমভাবে শক্তিশালী করে তুলুক। মৌলিক একত্বের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব কিছু দেবার মত বৈশিষ্ট্য প্রতিটি ধর্মের ও সম্প্রদায়ে রয়েছে—এ সত্য উপলব্ধি করাটাই হল প্রকৃত বিদ্যার ফল।

আসলে, ভারতের মত আর কোনও দেশকে এত বেশী দুর্বিপাক সহ্য করতে এবং এত অধিককাল বৈদেশিক শাসনের অধীনে থাকতে হয় নি। তা সত্ত্বেও সাহসের সঙ্গে নতুন যে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে ভারতীয়গণ প্রস্তুত কারণ এখনো তাদের জীবন মোটামুটিভাবে প্রাচীন আদর্শের উপর দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এটাই হল এদের জীবনধারার দৃঢ় ভিত্তি। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসই হল আত্মার উপর বিশ্বাস। কোন প্রকার দ্বিধা না রেখেই তারা নিশ্চিত যে, এই বিশ্বাস তাদের পরিচালিত ও রক্ষা করে আসছে।

ভারতীয় জীবনধারার এই নির্দেশক নীতি দেশের ভৌগলিক সীমারেখার ভিতর আবদ্ধ ছিল না। এদেশের লোকেদের ইচ্ছে থাক বা না থাক, অন্যান্য দেশেও তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। এগুলোর মূল্যবোধ চিন্তা ও অনুভূতিতে অনুপ্রবেশ করে তাদের সাহিত্যকেও রূপান্তরিত করে দিচ্ছে।

প্রকৃতি বিজ্ঞান আমাদের শুধু আহার, পোষাক, ইত্যাদি যোগাতে পারে। একমাত্র আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানই তাকে শক্তি ও দৃঢ় সংকল্প দিতে পারে। এ বিষয়ে ছাত্রদের বিশেষ নজর দেওয়া উচিৎ। একজনের যদি শক্তি ও স্থির সংকল্প না

থাকে, তাহলে আহার, পোষাক, ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে থাকলেও কি লাভ, তা ভেবে দেখ।

আবার, জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করতে চাইলে নিজের ভেতর যথাসাধ্য আধ্যাত্মিক সম্পদ সংগ্রহ করা অবশ্য প্রয়োজন। প্রাচীনকালে এই প্রয়োজন জানা ছিল এবং এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে প্রচেষ্টা চালানো হত; ভবিষ্যতেও এই প্রয়োজনকে উপলব্ধি করতে এবং পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ, সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বিশ্বাস ও প্রবণতা, যা এখন খুব ক্ষীণ এবং বিক্ষিপ্ত, সেগুলোকে একত্রিত ও নতুন করে শক্তিশালী করতে হবে।

ভারতীয়দের ধর্মের অনবদ্য বৈশিষ্ট্য হল তার দৃঢ় ভিত্তি। আকাশের ন্যায় তা বিস্তৃত ও প্রকৃতির ন্যায় চিরন্তন। একটি গাছের বহু ডালপালার মতো ধর্মেরও বহু মত ও সম্প্রদায় থাকতে পারে। অনুচিত বলে এগুলোর নিন্দা করা ঠিক নয়। কিন্তু কোন শাখাকেই অন্য শাখাগুলোর সঙ্গে বিবাদ বা প্রতিযোগিতা নামা উচিৎ নয়। তা শুরু হলে গাছটিরই মৃত্যু হবে এবং সকলেরই ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটবে। সম্প্রদায়গুলো যদি প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত হয় তবে ধর্মের পতন ও জগতের বিনাশ ঘটে। 'একম সৎ, বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' (কেবলমাত্র এক বর্তমান, জ্ঞানী লোক নানা ভাবে তার বর্ণনা দেন)।

ঈশ্বরের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, রূপ ও গুণ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ধারণা থাকতে পারে। কেউ কেউ বিশ্বাস করতে পারে যে তিনি মনুষ্য রূপ ও গুণের অধিকারী। কেউ হয়ত বিশ্বাস করতে পারে যে মনুষ্য রূপ ও চিহ্ন বর্জিত হলেও ঈশ্বর অভিব্যক্তির ভেতর প্রকাশিত। আবার কেউ কেউ ঈশ্বরকে পুরোপুরি নিরাকার বলে বিশ্বাস করতে পারে। প্রত্যেকেই কিন্তু তাদের বিশ্বাসের সমর্থন সূচক বক্তব্য বেদের ভেতর খুঁজে পাবেন। কারণ প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের প্রতি, অর্থাৎ নিগূঢ় শক্তি, বা সকলের উৎস, প্রতিপালক ও রক্ষক, যিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। এই সত্যই বেদে ঘোষিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

চোদ্দ

ঈশ্বরের নাম বা রূপ সম্পর্কে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেটা খুব বড় নয়। ঈশ্বর বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য নিয়ে আমাদের বিবাদ করবার কোন কারণ নেই।

সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়াটাই হল যথেষ্ট সেবা। বিশ্বজগৎ ও তার অংশ পৃথিবীর উৎপত্তি কয়েক হাজার বছর আগে হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে কোন সময় এর বিলুপ্তি ঘটবে,—অপর সকলেরই এই ধারণাকে ভারতীয়গণ স্বীকার করে না। শূন্য থেকে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, এই ধারণাকেও তারা গ্রহণ করে না। তারা বিশ্বাস করে যে প্রকৃতি বা অভিক্ষেপ শূন্যতা থেকে আসে না, বরং তা হল সদা-পূর্ণ, সম্পূর্ণ। তার কোন আদি নেই, অন্তও নেই, এর শুধু স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে। পূর্ণতা এবং সম্পূর্ণতার কোনো চিহ্ন নেই বলে গোড়াতে শূন্যতা ছিল— এই সিদ্ধান্তে আসাটা কোন বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। অস্তিত্বের আরো স্তর রয়েছে, যা বিচার করতে হবে।

যেমন, মানুষ পুরোপুরিভাবে দেহ নয়, তার এই স্থূল দেহে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম দেহ,—মন, এবং এই মনের চেয়েও সূক্ষ্ম আর একটি দেহ রয়েছে—জীবাত্মা, বেষ্টিগত আত্মা, স্ব-সত্তা। এই শেষ দেহটির কোন আদি বা অন্ত নেই, মৃত্যু বা বিনাশের কোন লক্ষণ নেই। এই সত্যে ভারতীয়গণ আস্থাবান। স্বয়ং বেদের ঘোষণার উপর এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। আরাধনা করবার সময় আমরা চোখ বন্ধ করি। মাথা উপরদিকে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা বাইরে কোথাও ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি না। আর সবাই বলে থাকে যে, তাদের শাস্ত্রগ্রন্থ গুলো দিব্য প্রেরণা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত। কিন্তু ভারতীয়গণ বিশ্বাস করে যে বেদ হল মুনি ঋষিদের অন্তর থেকে উত্থিত স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী।

শিক্ষার্থীগণ! যে নিজেকে তুচ্ছ ও দুর্বল বলে দিন রাত নিন্দা করে তার দ্বারা কোন কাজ হতে পারে না। নিজেকে যে হতভাগ্য ও নিচ বলে মনে করে, সে হতভাগ্যও নীচ হয়ে যায়। অপরদিকে, তুমি হলে দিব্য স্ফূলিঙ্গ, দিব্যত্ব হল তোমার সত্ত্বা—এই প্রতিটি বিকাশ যখন ঘটাবে তখন তুমি সকল শক্তির প্রভু হয়ে বসতে পারবে। "যেমন মনে করবে তেমনি হবে (যদ্ ভাবম্ তদ্ ভবতি)। তুমি কি মনে করছ সেটাই হল আসল। তুমি যা আছ, তার ভিত্তিই হল তা। আত্মা, স্ব-সত্ত্বার উপর আস্থা রাখ। মানুষের এটা অবশ্য কর্তব্য। এর অভাবে মানুষ পাপী ও দুষ্ট দানবে পরিণত হচ্ছে। তোমার পূর্বপুরুষগণ শুধুমাত্র ঐ বিশ্বাসের মাধ্যমেই সৌভাগ্য, শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে এবং তাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই বিশ্বাস হারালে মানুষের পতন অনিবার্য। কারণ, ঐ বিশ্বাস হল প্রাণস্বরূপ। প্রাণ না থাকলে মানুষ হল শব, ঐ বিশ্বাসরূপ

প্রাণ থাকলে মানুষ হয়ে ওঠে শিব। আত্মবিশ্বাস হল মানুষের ভিতরকার শিব সত্ত্বার অভিব্যক্তি; ঐ বিশ্বাস মানুষকে সকল প্রকার শক্তির অধিকারী ও তাকে পূর্ণ করে তোলে। কারণ আত্মা হল স্বভাবতই স্বয়ং সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ। ঐ স্তর লাভ করবার জন্যে কোন সাধনার প্রয়োজন নেই।

বিশুদ্ধতা হল আমাদের স্বভাব, পরিপূর্ণতাও আমাদের প্রকৃতি। অশুদ্ধতা ও অপরিপূর্ণতা হল মানুষের নিকট অপরিচিত, বিদেশীয়। এই সত্যকে অবহেলা বা ভুলে যাওয়া শিক্ষার্থীদের উচিত নয়। প্রকৃত শিক্ষা এই বিশ্বাসকে অবশ্যই জাগিয়ে তুলবে এবং পূর্ণতার এই উপলব্ধিকে প্রতিটি কর্মে সঞ্চালিত করবে। এটা হল অত্যাবশ্যক লক্ষ্য, সঠিক শিক্ষার সার বিশেষ।

আর একটি সত্য রয়েছে, যাকে আর সবকিছু থেকেও বেশী আমাদের মনে রাখতে হবে। ভারতীয়দের জন্য ধর্ম বলতে অভিজ্ঞতা বোঝায়, আর কিছু নয়। নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত না হলে কোন সাফল্যই আমাদের কাছে মূল্যবান নয়। মূল্যবান সবকিছুই নিজেকে অনুশীলন করে করতে হবে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও সাধনার জন্য দিব্যকরুণা অপেক্ষা করে থাকে। ধর্মীয় তত্ত্ব ও নির্দেশকে প্রকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে হবে। তোতাপাখির মত আবৃত্তি করতে শেখাটাই যথেষ্ট নয়।

সত্যকে চিনতে হবে, এটা হল একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। যত তাড়াতাড়ি আমরা সত্যকে জানতে পারব, তত তাড়াতাড়ি ধর্মীয় বিরোধ ও মতভেদ অদৃশ্য হয়ে যাবে। পরাৎপর (দূরের চেয়েও দূরে), সর্বভূতাত্মা হচ্ছেন নিকটতমের চেয়েও নিকট, আর সব সত্ত্বা আপাতঃ নিকট হলেও আসলে বহু দূরের। এই সত্য সম্পর্কে অবহিত হও। তাহলেই যে গ্রন্থিতে মন আবদ্ধ হয়ে আছে, তা খুলে যাবে।

পাশ্চাত্যের বিধান অনুযায়ী মানুষ 'জীবন' ত্যাগ করে থাকে, কিন্তু ভারতীয়দের ভাষায় মানুষ 'দেহ' ত্যাগ করে। পাশ্চাত্য দেশীয়গণ বলে থাকে যে, তাদের দেহ আছে এবং সেই দেহের আছে আত্মা। ভারতীয়গণ একথা বলে না। তারা ঘোষণা করে যে, মানুষের আত্মা রয়েছে এবং সেই আত্মা ক্ষণকালের জন্যে দেহে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং তারা মনে করে যে ইন্দ্রিয়সুখ ও ঐহিক যশ বালির ভিতের উপর তৈরী এবং তা ভেঙ্গে পড়বার আগে অল্প কয়েক দিনের জন্য উজ্জ্বল থাকে।

শিক্ষার্থীগণ, অনুকরণ কখনো কৃষ্টি হতে পারে না। তুমি রাজপোষাক পরতে পার এবং ঐ ভূমিকায় অভিনয় করতে পার, কিন্তু ঐ অনুকরণের দ্বারা কি রাজা হয়ে যাবে? বাঘের চামড়া গায়ে দিয়ে গাধা কখনো বাঘ হতে পারে না। অনুকরণ হল কাপুরুষতার লক্ষণ। তা কখনো উন্নতি ঘটাতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, অনুকরণ করবার প্রবৃত্তি মানুষকে ধাপে ধাপে ভয়াবহ আকৃতিতে নামিয়ে দেয়। তোমাকে তোমার মত করেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিজে ভারতীয় বলে তোমার গর্ববোধ করা উচিৎ, পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে তোমার গর্বিত হওয়া কর্তব্য। তুমি ভারতীয়, এই আনন্দময় দৃঢ়োক্তির ভেতরই তোমার প্রশংসনীয় বীরত্ব নিহীত আছে। অপরকে অনুকরণ এবং তাদের চালচলন নকল করা তোমার উচিৎ নয়; যদিও তাদের ভালকে তুমি গ্রহণ করতে পার।

অপরের কাছ থেকে ভাল জিনিসটি তুমি শিখে নিতে পার। আমরা মাটিতে বীজ বপন করি। তাতে মাটি, সার ও জল দিই। বীজ অঙ্কুরিত হয়, ছোট্ট চারাগাছ, এবং তা থেকে বিরাট মহিরূহে পরিণত হয়। মাটিতে রাখবার ফলে বীজ মাটি হয়ে যায় নি, আবার সার পেয়ে সার বা জল গ্রহণ করে জলে পরিণত হয় নি। এদের কাছ থেকে যতটুকু উপকার পেতে পারে সে শুধু তাই গ্রহণ করেছে। আসলে সে যা, অর্থাৎ বিশাল বৃক্ষ, তাতেই সে নিজেকে তৈরী করেছে।

মানুষ, তুমিও এমনিভাবে নিজেকে তৈরী কর। অপরের কাছ থেকে অনেক কিছু তোমার শেখবার আছে। পরমকে জান এবং নিম্নতম অবস্থা থেকেও তাকে লাভ করবার উপায় শিখে নাও, উন্নতিশীল আধ্যাত্মিক সাধনা কি করে অনুশীলন করতে হয় তা অপরের কাছ থেকে জেনে নাও এবং নিজেকে তা দিয়ে সম্পৃক্ত করে দাও। কিন্তু নিজেকে তাদের মত করে পালটে দিও না। মনুর স্মৃতিশাস্ত্র মানুষকে এই নৈতিক শিক্ষাই দিয়ে থাকে। এই শিক্ষাই শিক্ষার্থীগণকে বুঝতে হবে। এই হল প্রথম এবং আদি পাঠ, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পাঠ।

পনের

শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ বিষয়ে তুমি পণ্ডিত হতে পার, কিন্তু বৈরাগ্যের মনোভাব আয়ত্ত করতে না পারলে ঐ পাণ্ডিত্যের কোন দাম নেই। অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেয়া, অপরের সেবা করা—এই হল বিদ্যার মূল সূত্র, প্রকৃত

অভিব্যক্তি। অন্তরে সেবার মনোভাবকে জাগ্রত করতে পারলেই বিদ্যা হয়ে ওঠে মহান। প্রদত্ত সেবাকে সংকীর্ণ স্বার্থপরতার চিহ্ন মাত্র থেকে মুক্ত হতে হবে। শুধু তাই যথেষ্ট নয়। পরিবর্তে কোন কিছু লাভ করবার বাসনা সেবার সংকল্পকে যেন কলুষিত না করে। যে মনোভাব নিয়ে তুমি যজ্ঞ সম্পাদন কর, ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে সেবা করতে হবে। গাছ যেমন নিজের ফলকে না খেয়ে ত্যাগের বশবর্তী হয়ে অপরকে দান করে, নদী যে জল বহন করে তা যেমন সে পান না করে পীড়িতদের তৃষ্ণা ও উত্তাপ কমিয়ে আনে, গরু যেমন তার নিজের বাছুরের জন্যে সৃষ্ট দুধকে বৈরাগ্যজাত উদারতাবশতঃ অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেয়, তেমনি যারা বিদ্যা অর্জন করেছে, সেবার মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ও স্বার্থপর উদ্দেশ্যের প্রতি নজর না দিয়ে অপরকে তাদের সেই বিদ্যা দান করতে হবে। এভাবেই তারা নিজেদের সজ্জন লোক বলে প্রমাণ করতে পারবে।

সত্যিকারের পণ্ডিত ব্যক্তির চিন্তার ভেতর কখনও অহংভাবের জায়গা থাকে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আজকাল পণ্ডিত শ্রেণীর সকলেই সীমাহীন অহংকারে পীড়িত। ফলে তারা ভ্রান্ত আদর্শ অনুসরণ করে এবং ভুল পথ বেছে নেয়, বিদ্যালাভের ফলকে শুধুমাত্র নিজেদেরই এবং নিকট আত্মীয়দের জন্যই ব্যবহার করে। তাই সজ্জনদের ভেতর স্থান ও ঐ স্থানের উপযুক্ত সম্মান তারা হারিয়ে ফেলে। বিদ্যার মাধ্যমে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টি তারা লাভ করে, মুক্তহস্তে তা সকলকে দান করতে হবে। তা না করলে, মনুষ্য প্রগতিই বিপদাপন্ন হয়ে উঠবে। মানব জাতির মঙ্গলসাধনের জন্য প্রয়োজন হল পরোপকার ও অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেবার মত পবিত্র মনোবৃত্তিকে পোষণ করা।

'মানব সেবাই মাধব সেবা'—এই তোতাপাখীর মত কথা সকলের কাছে পৌঁছায় না। এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্যকে যারা তারা কোন মানবকে সেবা করতে হবে তা ভেবে দেখে না। নিজের উদরপূর্তিতেই তারা আগ্রহী; এই কারণেই নিজেদের মানসিক পরিসীমাকে তারা আপন লোকেদের উপকারের ভেতর সীমাবদ্ধ রেখে দেয়। যে মূল্যবান বিদ্যালাভ তারা করেছে তার অপচয় এভাবেই করে থাকে। মানুষ ভুলে যায় যে, ভগবান সকল প্রাণীর ভেতর দিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে আছেন। যে কোন জীবের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রধান লক্ষ্য তাই হওয়া উচিৎ।

নরই হল নারায়ণ। মানুষই ভগবান। মানুষের প্রতিটি কর্মকে ঈশ্বর সেবার স্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন। কিন্তু নারায়ণ আসলে কে এবং নরই বা কি, তা আজকালকার ছাত্ররা জানে না। নর-নারায়ণ তত্ত্বকে যে বুঝতে পারে না, সে কি করে নিজেকে শিক্ষিত বলে দাবী করতে পারে? উপনিষদে এই সত্তাদুটোকে 'ত্বম' ও 'তৎ', 'তুমি' ও 'উহা' বলে বর্ণিত হয়েছে। এই দুয়ের সম্পর্কে যার জ্ঞান হয়নি, সে নিজেকে জেনেছে বলে দাবী করতে পারে না এবং যে শিক্ষা নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশ করে না, তার অন্য সব কিছু প্রকাশ করবার কি সার্থকতা থাকতে পারে? কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, যে সকল পণ্ডিত আজকাল শিক্ষাদানে নিযুক্ত, তারা আমাদের স্বার্থরক্ষা ও উপকার ত করছেই না বরং আমাদের অপকারই করছে। এটা সত্যিই অদ্ভুত। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কখনই যারা তাদের সাহায্য করছে শুধু তাদের সেবাই করবে না, তাদের যারা ক্ষতি করছে তাদেরও সেবা করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী সেবাকে দ্বিগুণ পবিত্র করে তোলে। যারা আমাদের সেবা করছে, তাদের সেবা করাটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। যারা আমাদের অপকার করছে, তাদের সেবা করাটাই হল আরও বেশী পবিত্র। কারণ, এই দ্বিতীয় প্রকার কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হল নিজের সর্বোত্তম স্বার্থের গভীরতম উপলব্ধি এবং স্থান, কাল ও অবস্থার সচেতন অনুভূতি। শিক্ষা অবশ্যই এই সকল গুণাবলীর আহরণ ও অনুশীলন করবে।

অমার্জিত লোকেদের সঙ্গে চলাফেরায় সাবধান হতে হবে। যে সব অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি উপকার পেয়ে তা ভুলে যায়, তাদের বেলাতেও একই রকম সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আইন হচ্ছে, যারা অন্যায় করে তাদের শাস্তি দেবার জন্যে সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্র। কিন্তু অন্যায়কারীদের পুরোপুরিভাবে বর্জন করাটা শিক্ষিত ব্যক্তি ও ছাত্রদের উচিৎ নয়। তাদের কর্তব্য হল নিজেদের স্বাভাবিক গুণ—বৈরাগ্যকে প্রকাশ করা ও সহজাত বৈশিষ্ট্য—সহায়তার মনোভাব অনুশীলন করা।

মাতৃভূমিকে রক্ষা করা হল পবিত্র কর্তব্য। তা প্রতিটি ছাত্রের প্রাথমিক কর্তব্য। কি তার কর্তব্য এবং প্রয়োজনের সময় তার প্রাথমিক ভূমিকাই বা কি হবে—তা জানতে এবং প্রয়োগ করতে না পারলে কোন ছাত্রই কিছু শিখতে পেরেছে বলে দাবী করতে পারে না। শিক্ষিত ব্যক্তি ও শিক্ষার্থী, এই উভয়কেই সরলতার অনুশীলন করতে হবে; তাদের সর্বপ্রকার জাঁকজমককে ত্যাগ করতে

হবে। জাঁকজমকের ভেতর প্রকৃত স্ব-স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যায়। এদিকে ছাত্রদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিজ্ঞানের সকল শাখায় কেউ পণ্ডিত হতে পারে বা বিদগ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে, কিন্তু অপরের সঙ্গে ব্যবহারে বিনয় ও নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে তাকে পণ্ডিত ও বিদগ্ধ সমাজের বহির্ভূত ব্যক্তি বলেই ধরতে হবে। এরূপ ব্যক্তির প্রতি সমাজ সম্মান দেখায় না। তারা কিছু সময়ের জন্যে হয়ত সম্মান পেতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই তা হারিয়ে ফেলে। ঐ সম্মান কখনও প্রাপকের কৃতিত্ব বাড়ায় না। অকৃত্রিমতা ও সরলতাই সম্মান অর্জন করতে পারে। সম্মানকে এরা উপভোগ্য করে তোলে। পাণ্ডিত্যের উন্মত্ত বাহ্যিক প্রদর্শনী শুধুমাত্র পর্যায়ক্রমে খ্যাতি ও বিদ্রূপকে নিয়ে আসবে। জাঁকজমককে ত্যাগ করলে কৃত কাজ থেকে স্থায়ী সম্মান লাভ করা সম্ভব হয়। প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করে বৈরাগ্যের মনোভাব, জাঁকজমকের প্রতি অনাগ্রহ ও অপরের সেবা করবার আগ্রহ।

অল্প খানিকটা বিদ্যা অর্জন করতে পারলেই অনেকে দাম্ভিক হয়ে ওঠে। তারা সব কিছুতেই পণ্ডিত বলে ভান করে এবং নিজেদের কৃতিত্ব নিয়ে সর্বক্ষণ গর্ব করে বেড়ায়। এমন সদর্পে ঘুরে বেড়ায় যেন সব কিছু জানে। "পাতার থালায় খাবার পরিবেশন করলে তা মেঝেতেই থাকবে, কিন্তু যে সব পাতার থালায় কোন কিছু দেয়া হয়নি তা বাতাসে উড়ে বেড়াবে"—এরকম একটি প্রবাদ রয়েছে। তেমনি যে লোকের অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব দক্ষতা আছে, সে নিরহংকার জীবন যাপন করে। কিন্তু প্রকৃত বিদ্যা অর্জন এবং ঐ বিদ্যা প্রদত্ত শক্তিলাভ যার হয়নি, সে জাঁকজমকপূর্ণ, অহংকারী জীবনযাপন করে থাকে। নিজের ক্রটিকে অপরের কাছ থেকে ঢাকবার জন্যে তাকে পরিশ্রম করতে হয়। দুই দিক থেকে তার বিনাশ আসে,—সে নিজেও আনন্দলাভ করে না, আবার অপরকেও আনন্দ দিতে পারে না। সে বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে।

সুতরাং জাঁকজমকের বাসনাকে অন্তরে প্রবেশ করতে দিও না। অহংকার যেন তোমার কাছে পৌঁছুতে না পারে। বিনম্র হও ও উচ্চ আদর্শের প্রতি অনুগত হও। তাহলেই তুমি জগতের শান্তি ও সৌভাগ্যের জন্যে কাজ করতে পারবে। "শ্রেয়ন্তে বিশ্বশ্রেয়াঃ"। ব্যক্তি যদি ভাল হতে পারে তবেই জগৎ ভাল হয়ে উঠবে। প্রকৃত শিক্ষার্থী হবার আগ্রহ যার রয়েছে তাকে অবশ্যই বিশ্বশান্তি ও

প্রগতির আদর্শকে নিজের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাকে বিনম্র হতে হবে। অপরের সেবা করবার প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। এই হল প্রকৃত বিদ্যার সার।

ষোল

বিদ্যার্থী ছাত্রের সকল জীবের প্রতি দয়া, মায়া ও প্রেম থাকতে হবে। জীবে দয়া হবে তার স্বভাব। এর অভাবে মানুষ হয়ে ওঠে অমার্জিত। বিদ্যা বলতে, অন্য সব তাৎপর্যের চেয়েও বড় করে বোঝায় জীবে দয়া। অপর কোন ব্যক্তির প্রতি মন্দভাব পোষণ করলে তার বিদ্যালাভ হবে অর্থহীন। গীতার উপদেশ, "অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং," "কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ না রেখে", ঐ একই বাণী বহন করছে। তেমনি গীতায় সাবধান করে বলে দেয়া হয়েছে, যে কোন প্রাণীর প্রতি অসম্মান, আঘাত ও অবহেলা প্রদর্শন হল ভগবানের প্রতি অসম্মান, আঘাত ও অবহেলা দেখানো। "সর্বজীবে তিরস্কারং কেশবং প্রতিগচ্ছতি"। প্রেম ও দয়া শুধুমাত্র মানুষের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকবে না। তা প্রতিটি জীবিত সত্তাকে পরিব্যাপ্ত করবে।

গীতায় আছে, "শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"। অর্থাৎ যে বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যার মাধ্যমে বিনয় অর্জন করেছে তাকে গরু, ব্রাহ্মণ, হাতী, কুকুর ও কুকুরমাংসভোজী চণ্ডাল,—সকলের প্রতি অভিন্ন করুণা ও সমদৃষ্টি দেখাতে হবে। এভাবে প্রদর্শিত সমদর্শন রূপান্তরিত হয়ে প্রাপকদের সমান হারে মঙ্গল সাধন করে থাকে। সকলের জন্যে মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করাটা হল বিদ্যালাভের পরিচায়ক। সম্প্রদায়ের ভেতর সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করতে হবে। পরম সত্য, প্রসারতম দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভারতীয় সংস্কৃতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এই আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়াটা হল বিদ্যার উদ্দেশ্য—ভারতে তাই বলা হয়। অন্য কোন দেশ, তার অধিবাসীদের সামনে এমন মহান, সর্বগ্রাহী, হিতকর আদর্শ তুলে ধরেনি।

বর্তমানে দেশ ধ্বংসের মুখে, কারণ এই আদর্শ অবহেলিত, বিদ্যা বহুলভাবে সীমিত ও শিক্ষাব্যবস্থা সমাজকে সংকীর্ণতা ও কপটতা দিয়ে কলুষিত করে দিচ্ছে। তাই এই ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। বর্তমানে আমাদের শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যালাভ হচ্ছে, কিন্তু বই থেকে যা শেখা হবে, সামাজিক

জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে তার অনুমোদন ও সংশোধন প্রয়োজন। তাহলেই মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভব। তার মাধ্যমেই শিক্ষা উন্নীত হবে বিদ্যার স্তরে। শুধুমাত্র পড়া, লেখা বা গণিতে পারদর্শিতা লাভ করে বিদ্যালাভ হয় না।

প্রতিটি ছাত্রের কর্তব্য হল, প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন লক্ষ্যটি শ্রেয় এবং কোন কর্মটি লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে শ্রেষ্ঠ, তা বুদ্ধিযুক্ত বিচারের মাধ্যমে স্থির করা। লক্ষ্য এবং কর্ম, এই উভয়কেই সমাজের প্রয়োজন মেটাতে, উন্নতির পক্ষে সহায়ক হতে হবে। অবিচার, বলপ্রয়োগ এবং ব্যভিচারে মত্ত হওয়া উচিৎ নয়। নিজের স্বার্থকে মূখ্য বলে মনে করাটাও উচিৎ নয়।

আর একটি বিশেষ গুণের প্রতি ছাত্রদের নজর দিতে হবে, তা হল পরিচ্ছন্নতা---বাহ্যিক ও আন্তর উভয়ই। এই উভয়ের কোন একটি না থাকলে মানুষ যে কোন কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত। তার পোষাক, তার বইপত্র এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেন পরিচ্ছন্ন থাকে। এই হল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা। অর্থাৎ, জীবনধারণের জন্যে যে সকল পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শে আসতে হবে, তার প্রত্যেকটিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। দাঁত ও চোখ, খাদ্য ও পানীয়, এসবে যেন নোংরা না থাকে। এগুলো পরিষ্কার থাকলে স্বাস্থ্যবান হওয়া যায়। প্রত্যহ দেহকে ঘসে মেজে ধুতে হবে, তা না হলে, নোংরার পলি থেকে গায়ে খোস, পাঁচড়া, চুলকানি হবে। তা আবার অন্যের দেহে সংক্রামিত হতে পারে। এর ফলে অবস্থা করুণ হয়ে উঠবে। কারও হয়ত একটি বা দুটি মাত্র পোষাক থাকতে পারে। কিন্তু পরবার আগে তা পরিষ্কার করে নিতে হবে। পোষাকে যেন ময়লা না জমে।

পড়বার বই যেন চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলে রাখা না হয়। বইয়ের পাতায় বেশী দাগ কাটা ঠিক নয়। খাতা যেন পরিষ্কার ও কালির ছোপশূন্য থাকে। বইখাতা দেখে অপরে যেন ছাত্রের পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করে। ছাত্রের ঘরে কোন দুর্গন্ধ থাকবে না। নিজের উপর সকলের ভালবাসাকে আকর্ষণ করতে ছাত্রদের সক্ষম হতে হবে। তার নিজের ঘর ও চারপাশের পরিবেশকে সুন্দর রাখা চাই। ঘরের দেয়ালে যেন কোন অশোভন ছবি টাঙানো না হয়। শুধুমাত্র মহৎ চিন্তা ও উচ্চ আদর্শের অনুপ্রেরণাদায়ক ছবি যেন চোখের সামনে থাকে।

যত বড় বিত্তবানই হোক না কেন, স্বাস্থ্য না থাকলে সে তার সম্পদ হতে পুরো আনন্দ পেতে পারে না। আহার্য তাকে ক্লান্ত করে তুলবে; আবার খাদ্য

ছাড়া সে দুর্বল হয়ে উঠবে। ফলে অসুখী অবস্থায় সে দিন কাটাবে। তাই বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য ও সুখ, উভয়কেই দিয়ে থাকে।

এখন আন্তর পরিচ্ছন্নতা—অর্থাৎ মন ও বুদ্ধিকে কালিমামুক্ত, শান্ত ও পবিত্র রাখা। চিন্তা ও অনুভূতি অপবিত্র ও উত্তেজিত হলে সুখী ও শান্ত হওয়া যায় না। মন অপবিত্র থাকলে প্রতিক্রিয়াও অপবিত্র হয়। মনকে পরিষ্কার রাখতে হলে, অপর সকলের সঙ্গে যুক্ত পরিস্থিতিকে এবং তাদের কাজকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে হবে এবং তারপর স্থির করতে হবে তাদের প্রতি তোমার প্রতিক্রিয়া কি হবে। তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। অপরের প্রতিক্রিয়াকে গ্রহণ করা ঠিক নয়। কোন কাজের শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিযুক্ত বিচার ও জিজ্ঞাসার পরই একটা কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিৎ। "আমাদের আপনজনেরা একটি কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করছে, তাই আমরাও ঐ পথের অনুগামী হব"—এই দৃষ্টিভঙ্গী হল ভুল, নীচ ও দুর্বলতার পরিচায়ক। মৌলিক অজ্ঞতাই হল তার কারণ। ভেড়ার পালের আচরণ ঠিক তেমনি।

মানুষের জন্ম গ্রহণ করে পণ্ডিত বলে দাবী করবে, অথচ বোকার মত অন্যকে অনুসরণ করে, অপরের কাছ থেকে ধার করা চিন্তা দিয়ে মনকে কলুষিত করবে—এসব পরিহার করতে হবে।

অপরের চিন্তা ও উক্তি কখনও কখনও ব্যক্তিগত হতে পারে, কিংবা তা অন্য লোকের প্রতি ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। তবে কেন আমরা ওগুলোকে আমাদের বলে ধরে নিয়ে, আমাদের অনুভূতিকে সেভাবে গঠিত করব? আমাদের অনুভূতি ও আচার আচরণে অপরের অনুকরণ করবার চেষ্টা করব না। আমাদের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও সহজাত পবিত্রতাকে বিসর্জন দেব না।

আমাদের নিজস্ব বিশ্বাসের কারণ হয়ত আমরা অনেক সময় জানতে না পারি। তা হল আমাদের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ এবং আমাদের অন্তরস্থিত শক্তিশালী অনুভূতি থেকে উৎপন্ন ও রূপায়িত। কিন্তু ওগুলোর মাধ্যমে আমরা যেন ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অসৎ কাজের পথে পরিচালিত না হই। ছাত্রদের সুদূরপ্রসারী ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি থাকতে হবে। একমাত্র তা হলেই সে উচ্চতর জ্ঞান লাভের অধিকারী হবে। একমাত্র তা হলেই সে সম্মান লাভ করতে পারে। সংকীর্ণ ও স্বার্থপর চিন্তা, অনুভূতি ও পরিকল্পনা থেকে বহুদূরে সে নিজেকে রাখবে।

সতের

মানুষের সকল প্রকার উদ্বেগ ও দুর্দৈবের মূল কারণ হল ঈর্ষা। ভগবদ্‌গীতায় আমরা দেখতে পাই যে, মাঝে মাঝেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সাবধান করে বলছেন, "অর্জুন! তোমাকে ঈর্ষাহীন হতে হবে। তুমি ঈর্ষা দ্বারা পীড়িত হয়ো না।" ঈর্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই ঘৃণা চলে আসে। এদুটো হল যমজ দুরাত্মা; যেন বিষাক্ত কীট। ব্যক্তিত্বের একেবারে গোড়ায় এরা আক্রমণ করে থাকে।

একটি গাছ ফুলে ও ফলে দীপ্ত হতে পারে। কিন্তু যখন অনিষ্টকারী কীট ঐ গাছের শেকড়ে তার কাজ শুরু করে দেয়, ভেবে দেখ তখন গাছটির কি দশা হয়! এমনকি গাছটির সৌন্দর্যের প্রতি মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ফুল শুকিয়ে আসে, ফল মাটিতে পড়তে থাকে, পাতা হলদে হয়ে আসে এবং বাতাস শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়। ক্রমে গাছটিই শুকিয়ে মরে পড়ে যায়। তেমনিভাবে যদি ঈর্ষা ও ঘৃণা অন্তরে সংক্রামিত হয়ে কাজ শুরু করে, তাহলে যত বুদ্ধিমান ও উচ্চশিক্ষিত একজন হোক না কেন, তার পতন অনিবার্য। সমাজের শত্রুতে সে পরিণত হয়; বিদ্রূপের পাত্র হয়ে ওঠে, কারণ সে আর তখন মানুষ থাকে না। সমাজের একজন বলে তাকে আর গণ্য করা হয় না। পরিশেষে, তার বিশ্বস্ত বন্ধুরাও তাকে পরিত্যাগ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সে তার নিজ গোষ্ঠীর সম্মানই হারিয়ে ফেলে এবং অপরের কাছ থেকে সাধারণ সৌজন্যটুকুও আদায় করতে সমর্থ হয় না। চিরকাল সে দুঃখে দিন কাটায়।

কোন শত্রুই ঈর্ষার মত শঠ হতে পারে না। অপর কোন লোককে নিজের চেয়ে বেশী শক্তিশালী, বেশী জ্ঞানী, বেশী সুনাম, অর্থ বা সৌন্দর্যের অধিকারী, এমন কি বেশী সুন্দর পোষাক পরিহিত দেখতে পেলে মানুষ ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। অপর ব্যক্তির ঐ অবস্থাকে গ্রহণ ও মেনে নিতে তার কষ্ট হয়। তার মন এগুলোকে ছোট করতে এবং লোকের চোখে হেয় করবার উপায় খুঁজে বেড়ায়। এ ধরণের প্রবণতা ও অসৎ প্রবৃত্তি যেন কখনই ছাত্র ও শিক্ষিত লোকেদের মনে দানা না বাঁধে। এগুলো যেন তাদের চরিত্রকে কলুষিত না করে।

অপর কেউ উপযুক্ত হয়ে উঠলে এবং গুণ ও আদর্শের জন্যে সম্মানিত হলে, ছাত্রদের উচিৎ তাতে সুখী ও আনন্দিত হতে শেখা। দৃষ্টির প্রসারতা ও মনোবৃত্তির বিশুদ্ধতাকে অনুশীলন তাদের করতে হবে। ঈর্ষার দানব যেন

ছাত্রদের কাবু করতে না পারে, সে বিষয়ে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। তাদের ভেতরকার মূল্যবান সবকিছুকেই ঐ দানব ধ্বংস করে ফেলবে। তাদের স্বাস্থ্য ও পরিপাক শক্তিকে ক্ষয় করে দেবে। তাদের ঘুম কেড়ে নেবে। তাদের দৈহিক ও মানসিক সহিষ্ণুতাকে গোপনে বিনষ্ট করে একজন পুরোনো ক্ষয়রোগীর পর্যায়ে নিয়ে আসবে।

ছাত্রদের উচিত যারা তাদের চেয়ে ভাল ফল করছে এবং তদনুযায়ী স্বীকৃতি লাভ করছে, অপর সেই সব ছাত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কৃতসংকল্প হওয়া। সেই সব ছাত্রের সমান জ্ঞান ও নম্বর পেতে তাদের সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। এটা যুক্তিসংগত উচ্চাভিলাষ। কিন্তু তা না করে, যদি অপর ছাত্রদের পতন কামনা করে এবং কেবলমাত্র নিজেদেরই সফলকাম বলে প্রমাণ করতে চায়, তবে তারা পাশবিক চরিত্রকেই প্রকাশ করবে। এই কামনা তাদের অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেবে। তা হল এক মারাত্মক ধরনের জীবাণু।

নিজের প্রশংসা ও অপরের নিন্দা করাটাও হল তেমনি মারাত্মক। নিজের নীচতা ও পাপাচারকে লুকিয়ে রাখাবার প্রচেষ্টা, সততার মুখোশ পরে থাকা, নিজের কৃতিত্বকে বাড়িয়ে বলা,—এগুলোই হল বিষাক্ত প্রকৃতি। একই ধরণের বিষাক্ত লক্ষণ হল অপরের ভেতরকার ভালকে উপেক্ষা করে, যত্নের সঙ্গে তাদের দোষকে খুঁজে বার করবার আগ্রহ। এমন কথা কখনও বলবে না যা অপরকে হেয় করে। যখন অপর কারও সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয় এবং তাকে আমাদের খুব পছন্দ হয়, তখন সে যে কাজই করবে তা আমাদের কাছে ভাল বলে মনে হয়। কিন্তু হাওয়ার পরিবর্তন হলে, একই ব্যক্তি যখন আমাদের বিরাগভাজন হয়, তখন সে ভাল কাজ করলেও তা আমাদের কাছে অনুচিত বলে মনে হয়। এ দুটো প্রতিক্রিয়াই হল ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। তা প্রশংসনীয় নয়। সুমতি শতকের একটি শ্লোক আমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে, "হে সুমতি (সৎবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি)! জেনে রাখ, ভ্রান্তও হয়ে ওঠে সঠিক, যখন বন্ধুত্ব থাকে দৃঢ়, যথার্থ হয়ে যায় ভ্রান্ত, যখন বন্ধুত্ব হয় শিথিল।"

ছাত্রদের কর্তব্য নিজেদের সুমতি ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করা। দুর্মতি (দূষিত, মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি) হওয়া থেকে নিবৃত্ত হতে হবে। জ্বালানির বিরাট একটি স্তূপকে ছোট্ট একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভস্মে পরিণত করতে পারে। এক ফোঁটা বিষ বিরাট পাত্রভর্তি দুধকে অপেয় করে দেয়। ঈর্ষা এবং ঘৃণা হল স্ফুলিঙ্গ, যা মানুষের ভেতরকার সৎগুণের স্তূপকে বিনষ্ট করে দেয়।

নিজের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার উপর সব সময় ছাত্রদের নজর রাখতে হবে। এগুলো যেন স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, ক্রোধ, লোভ এবং অন্যান্য মন্দ প্রবণতাকে অন্তরে প্রবেশ করা থেকে নিবৃত্ত রাখে। সব মন্দ প্রবণতা হল মানুষকে ফাঁদে আটকাবার জাল। এই সকল মন্দ প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরের পবিত্রতাকে এমনভাবে পরাভূত ও বশীভূত করে ফেলে যেন ঐ পবিত্রতা আর মানুষকে প্রভাবিত করতে না পারে। সেই ব্যক্তি তখন নিজেকে ভুলে যাবে এবং যে কোন নীচ ব্যক্তি বা উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করবে। ফল ভাল কি মন্দ হবে, সেদিকে নজর না রেখে সে তার জিহ্বার আদেশ মেনে আজেবাজে বকে যাবে; হাতের ইচ্ছানুযায়ী কাজেই সে হাতকে নিযুক্ত করবে।

এই ধরণের অনিষ্ট সাধন করেই কিন্তু ঈর্ষা ক্ষান্ত হয় না। অপরের নিন্দা প্রচারের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতে তা আমাদের উৎসাহিত করে। যুবকদের ভেতর এই দোষ বহুলভাবে প্রচলিত। স্বাভাবিকভাবেই এটা তাদের ভেতর চলে আসে, কারণ তা হল অজ্ঞানতার লক্ষণ। এই মন্দ স্বভাব থেকে অব্যাহতি পেতে রোজ ভোরবেলায় এবং ঘুমোতে যাবার আগে কিছুটা সময় মনের বিচার বিশ্লেষণ করতে ও যে সমস্ত দোষ প্রবেশ করেছে তাদের খুঁজে বের করবার জন্যে কিছুটা সময় ব্যয় করতে হবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাতে হবে এই প্রবণতা থেকে রক্ষা করবার জন্যে। একবার ঈশ্বরের করুণালাভ করলে, পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকা যায় যে ঐ সব অসঙ্গতি আমাদের চরিত্রকে আর বিকৃত করবে না। একজন বিচারশীল ছাত্রকে চিনতে পারা যায় সে যে সৎসঙ্গ নিয়ে চলাফেরা করে, যে সৎ কাজের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে এবং যে সৎ কথা উচ্চারণ করে, সেগুলোর মাধ্যমে।

এর জন্যেই আমি অনেক সময় জোর দিয়ে থাকি, "যে চোখ খারাপ কিছু খুঁজে বেড়ায়, যে কোন মন্দ হতে তৃপ্তি পায়, যে জিহ্বা অসৎকে কামনা করে, যে নাক দুর্গন্ধকে উপভোগ করে, যে হাত অশুভ থেকে আনন্দলাভ করে—তাদের পুরোপুরি পরিহার করতে হবে। যাদের এসব রয়েছে সে সব ব্যক্তিকে পরিহার করতে হবে। তা না হলে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে বাধ্য। পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভ্রান্ত কাজ হতে পঞ্চপ্রাণের ও পঞ্চকোষের বিনাশ ঘটে। যদিও ইন্দ্রিয় সুখের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী সুখ ও আনন্দলাভ হয়, কিন্তু একটি প্রবাদ আছে, "জরা ওৎ পেতে আছে"। ইন্দ্রিয়সম্ভোগ তাড়াতাড়ি দুঃখকে নিয়ে আসে।

অন্য সব গুণ থেকেও ছাত্রদের বেশী প্রয়োজন হল আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসের অভাব পতনের সূচনা চিহ্নিত করে। বর্তমানে জগৎ যে ধ্বংস ও দুর্দৈবের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এর কারণ, নিজের প্রতি বিশ্বাসকে লোকে হারিয়ে ফেলেছে। একমাত্র আত্মবিশ্বাসই প্রতিটি লোককে শান্তি ও সমৃদ্ধি দিতে সক্ষম। সর্বত্র সবকিছু ভালকে সে লাভ করে, সর্বত্র সে সম্মানিত হয়। সে যা কিছু স্পর্শ করে, তাই সোনা হয়ে দাঁড়ায়। নিজের উপর বিশ্বাস না থাকলে সে কি করে অপরকে বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করলেও তা ঐকান্তিক বা দৃঢ় হতে পারে না। তা কৃত্রিম ও অগভীর হবে। নিজের মাতা, পিতা, স্ত্রী, সন্তানের উপর বিশ্বাসও এ ধরনের লোকের থাকে না। সে শুধু বিশ্বাস করবার ভান করে মাত্র, সুতরাং তার আচরণ হয় বিশ্বাসঘাতকের মত এবং সে তার পিতামাতাকেও আঘাত দিতে পারে।

সুতরাং, প্রতিটি ছাত্রের জন্য আত্মবিশ্বাস হল অপরিহার্য। যারা ন্যায় ও সরল পথ অনুসরণ করে গেছেন তাদের সম্পর্কে লিখিত বই ছাত্রদের পড়তে হবে। ধর্মশাস্ত্রে যে সকল নৈতিক অনুশাসন নির্দিষ্ট আছে সেগুলো অনুসরণ করবে, অবহেলা করবে না। আমাদের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য পুরাণসমূহে মৌলিক আদর্শ সন্নিবেশিত হয়েছে।

আঠার

দিক্ ও লক্ষ্যকে শিক্ষক ব্যক্ত করে দেন। ছাত্রগণ পথ তৈরী করে ভবিষ্যতের অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। শিক্ষকদের চরিত্র ও গুণাবলীর আনুপাতিক হারে মানবজাতির নৈপুন্য, শক্তি, অবস্থা ও মর্যাদার রূপায়ণ ও বৃদ্ধি লাভ ঘটে। চরিত্রই হল ব্যক্তির বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। জ্ঞান ও কর্মের উচ্চতর স্তরে ছাত্রদের তুলে দেবার মহান দায়িত্বে নিজেদের শিক্ষা ও জ্ঞানকে উৎসর্গ করা শিক্ষকদের কর্তব্য। যে নৈতিকতাকে ছাত্রদের ভেতর প্রবাহিত হতে তারা সাহায্য করছেন, সমাজের উন্নতির জন্যেও তা প্রয়োজন। অন্তরে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ পূর্ণ মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠেন। চরিত্রহীন জীবন হল প্রদীপহীন পূজোর বেদী, জাল মুদ্রা বা সুতো ছেঁড়া ঘুড়ি।

কত মাইনে পাচ্ছেন তার প্রতি নজর রেখে যে শিক্ষক শিক্ষা দিয়ে থাকেন, অথবা, ভবিষ্যতে কি ধরনের চাকুরী পাওয়া যেতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে

যে ছাত্র শিক্ষাকে গ্রহণ করে, তারা উভয়েই হল ভুল পথের অনুগামী। বস্তুতঃ শিক্ষকদের কাজ হল, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশসাধন ও নৈপুণ্যের পরোৎকর্ষতার অভিমুখে অগ্রগতির জন্যে ছাত্রদের নির্দেশ ও উৎসাহ দানের কর্তব্য পালন করা। ছাত্রদের কাজ হল, নিজেদের দিব্যত্বকে প্রস্ফুটিত করা এবং তাদের দক্ষতা ও জ্ঞানের সাহায্যে সমাজের সেবা করবার জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করা।

মানুষের তিনটি অস্ত্র আছে ঃ মন—যা তাকে চিন্তায় লিপ্ত করে, বাক্‌শক্তি—যা দিয়ে সে চিন্তার আদানপ্রদান করতে পারে এবং কর্মক্ষমতা—যার মাধ্যমে সে তার চিন্তাকে নিজের বা অপরের প্রয়োজনে একা বা দলবদ্ধভাবে কার্যে রূপায়িত করতে পারে। মন যে চিন্তার রূপ দেয় তা সহায়ক কিংবা ক্ষতিকারক হতে পারে। মন মানুষকে কামনা-বাসনা ও হতাশার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করে দিয়ে তাকে বন্ধনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আবার তা মুক্তি, বৈরাগ্য ও নিষ্কামভাব এনে দিতে পারে। মন হল পছন্দ-অপছন্দের একটি পুঁটুলি। মানস (মন) হল মনন (ঐন্দ্রিয়ক ও মানসিক অভিজ্ঞতার রোমন্থন)-এর পীঠস্থান।

দুটো কাজে মন নিযুক্ত থাকে ঃ আলোচনা বা পরিকল্পনা এবং সম্ভাষণ বা আলাপ। এদুটোই বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে। মনের সামনে যে সকল সমস্যার উদয় হয়, তার সমাধানে পরিকল্পনা আগ্রহী। সমস্যার সংখ্যাকে বাড়িয়ে দিয়ে আলাপ বিভ্রান্তি এনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং সমাধানের প্রচেষ্টাকে ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর পথে পরিচালনা করে। আন্তর সংলাপ ও বিতর্কিত বাক্যালাপ সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, নিদ্রা আচ্ছন্ন না করা পর্যন্ত, এক নাগাড়ে চলতে থাকে। ফলে স্বাস্থ্যহানি ও অকাল বার্ধক্য ঘটে। অপরের ত্রুটি ও বিফলতা এবং তাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকে ঘিরে মনের এই আলাপ চলতে থাকে। মানুষের সকল দুঃখকষ্টের মূলে রয়েছে এই বিরামহীন সংলাপ। তা মনকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দেয়। অতি দ্রুততার সঙ্গে তা বেড়ে ওঠে এবং মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্যবোধকে দমন করে রাখে।

জাগ্রত অবস্থায় যে সংলাপ মনকে আশ্রয় করে, তা স্বপ্নেও প্রবল থেকে মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটায়। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই সব অনুশীলনের সামগ্রিক ফল হল শূন্য। এই দোষ হতে মুক্ত হতে সফল না হলে, কোন লোকই নিজেকে পূর্ণ মানব বলতে পারে না।

আন্তর শান্তির এই প্রতিবন্ধকের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে উপনিষদে কিছু সাধনার উল্লেখ রয়েছে। প্রথম সাধনা হল প্রাণায়াম—শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ। প্রাণায়াম কোন ব্যায়াম নয়, আবার ভয়ানক কোন প্রক্রিয়াও নয়। শ্বাসগ্রহণ হল পূরক, শ্বাসত্যাগ হল রেচক, আর মধ্যবর্তীকালের শ্বাসধারণ হল কুম্ভক। শ্বাসধারণের সময়কাল এবং প্রশ্বাস ও নিশ্বাসের প্রক্রিয়ার উপর মনকে নিবিষ্ট করতে হবে। এভাবে মনকে স্থির করলে অন্যান্য তুচ্ছ বিষয়ের সংলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। আর মানসিক শক্তি অর্জিত হবে।

দ্বিতীয় সাধনা হল ঃ কর্মে, কল্যাণকর কর্মে,—অর্থাৎ মানবসেবা, যা অহংবোধকে নষ্ট করে, যে সকল কর্ম সৎ ও পবিত্র, সেই সব কর্মে, নিযুক্ত হওয়া। চিন্তা এই সকল সৎ কর্মে নিমগ্ন থাকলে যে অবান্তর সংলাপকে সে সাধারণতঃ প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, তা থেকে মন আপনিই সরে আসবে।

এরপর, শ্রবণ (আধ্যাত্মিক উপদেশ শোনা), মনন (আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর চিন্তা), নিদিধ্যাসন (আত্মার উপর বিশ্বাসকে দৃঢ় করবার জন্যে উপায় নির্ধারণ), জপ, তপস্যা (ইন্দ্রিয় সুখের অনুসরণ থেকে মনকে নিবৃত্ত করা),—এই সকল সাধনাকেও শাস্ত্রগ্রন্থগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ঐ মানসিক সংলাপ বন্ধ করে প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করবার জন্যে। কারণ একমাত্র মন নির্মল ও স্বচ্ছ হলে তবেই এই নিগূঢ় কর্তব্য সাধন সম্ভব। একমাত্র তখনই প্রদত্ত শিক্ষা ও প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বিশুদ্ধ ও অকলুষ হতে পারে।

দ্বিতীয় যে অস্ত্র মানুষকে তার অগ্রগতি অর্জনের জন্যে প্রদত্ত হয়েছে, তা হল বাক্‌শক্তি—ভাষার ব্যবহার। উক্তি হল প্রবল ক্ষমতার অধিকারী। কথা বলার মাধ্যমে আমরা যখন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট এমন কিছু জ্ঞাপন করি, যা তার ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করে দেয়, কিংবা তাকে আঘাত দিয়ে শোকাহত করে, তখন ঐ সকল উক্তি তার দৈহিক ও মানসিক সাহসকে পুরোপুরি বিনষ্ট করে ফেলবে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, মাটিতে পড়ে যাবে। অপরপক্ষে, বাক্যের মাধ্যমে যদি আনন্দদায়ক কোন কিছু, কিংবা আশাতীত উৎসাহব্যঞ্জক কোন কিছু নিবেদন করা হয়, তাহলে সে হস্তীর ন্যায় শক্তি লাভ করবে। কথা বলবার জন্যে কোন আর্থিক মূল্যের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু কথা হল মহা মূল্যবান। সুতরাং অতি সতর্কতার সঙ্গে তা ব্যবহার করতে হবে। নিষ্ফল গালগল্পের জন্যে তা ব্যবহার করা উচিৎ নয়। বিশুদ্ধ ও ফলদায়ী উদ্দেশ্যে করা উচিৎ। বাক্যকে

দোষমুক্ত করবার জন্যে প্রাচীনকালে মৌনব্রত পালন করবার প্রচলন ছিল। ঈশ্বরের আন্তর দর্শনের জন্যে অন্তর্মুখী মন্ত্র ও বর্হির্দর্শন অভিমুখী বাক্য—এই উভয়ই আধ্যাত্মিক শক্তি ও সফলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

উনিশ

চিন্তা, বাক্য ও কর্মের জন্যে যে তিনটি যন্ত্র মানুষ ব্যবহার করে থাকে, তাদের ভেতর তৃতীয়টি হল দেহ,—বাক্যে প্রকাশিত চিন্তাকে কার্যে রূপায়িত করবার জন্যে সদা-তৎপর হস্তসহ দেহ। যে তৎপরতা, কর্ম কিংবা পরিশ্রমে মানুষের হাত নিযুক্ত হয়, তাই হল তার সকল সুখ কিংবা দুঃখের উৎস। মানুষ হয়ত বলবে যে সে সুখী, কিংবা সে উদ্বিগ্ন বা ভীত অথবা সে বিপদাপন্ন। আর এই অবস্থার জন্যে সে নিজেকে বাদ দিয়ে অপর সকলকে দায়ী করে যাবে। এক ভ্রান্ত ধারণার উপর এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। সুখ বা দুঃখ হল তার নিজস্ব কর্মপ্রসূত। এই সত্য মানুষ গ্রহণ করুক বা অস্বীকার করুক, তাকে কিন্তু তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। এটাই হল প্রকৃতির নিয়ম। শীত বা গ্রীষ্ম, অগ্নি বা বৃষ্টিকে একজন বিশ্বাস নাও করতে পারে, কিন্তু ঠাণ্ডা বা গরম থেকে সে অব্যাহতি পেতে পারে না। এদের প্রভাব তাকে কাবু করবেই। সুতরাং সবচেয়ে ভাল হল, আমাদের কর্মকে সঠিক পথে পরিচালনা করা।

শুধু হাতই মনুষ্য কর্মে নিযুক্ত একমাত্র অঙ্গ নয়। যে কাজই কর না কেন, যা কিছুই দেখবে, যা কিছু শুনবে, এদের পবিত্রতা সম্পর্কে তোমায় নিশ্চিত হতে হবে। চিন্তা, বাক্য ও কর্ম হবে অহমিকা, লোভ ও দ্বেষশূন্য। উক্তি যেন এই সকল দোষ হতে মুক্ত হয়; আকাঙ্ক্ষিত বস্তুতে যেন এই সকল বাহ্যিক আকর্ষণ না থাকে। প্রার্থিত আনন্দ যেন মন্দ কিছু দিয়ে কলুষিত না হয়। এই সকল মানসিক শিক্ষা ছাত্রদের আয়ত্ত করে তাদের বাক্যে রূপায়িত করতে হবে। এভাবে বাক্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষা যেন ছাত্রদের কর্মে অনুসৃত হয়।

আজকাল অবশ্য শিক্ষা মনের পরিবর্তন আনে না। কানের ভেতর দিয়ে শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষালাভের সমাপ্তি ঘটে। কানের ভেতর দিয়ে যা প্রবেশ করে, তা মনের কাছে পরিষ্কার নাও হতে পারে; অস্পষ্ট একটা রূপ নিয়ে মনের কাছে তা উপস্থাপিত হতে পারে। তাই এমন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হবে

যাতে মন সে শিক্ষাকে অতি প্রাঞ্জলভাবে গ্রহণ করতে পারে। আর, তা করতে হলে, শিক্ষাকে এমন মস্তিষ্ক, জিহ্বা ও হস্তের সাহায্যে পরিবাহিত হতে হবে, যা হল বিশুদ্ধ, কোন প্রকার কালিমা দ্বারা বিপথগামী নয়। কেবলমাত্র তা হলেই শিক্ষালাভ হবে স্বচ্ছ এবং প্রজ্ঞা হবে প্রদীপ্ত।

শুধুমাত্র কয়েক বছরের জন্যে ছাত্রগণ বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত থাকে, কিন্তু শিক্ষকদের নিরন্তর অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকতে হয়, যাতে তারা নিজেদের ঐ মহান পেশার উপযুক্ত করে নিতে পারে। সুতরাং একমাত্র শিক্ষকগণই প্রকৃত ছাত্র বলে গণ্য হতে পারেন। কে প্রকৃত ছাত্র, এই প্রশ্নের উত্তর হল, "শিক্ষক"। "আমি এমন আদর্শ ছাত্র হব, যা আমার ছাত্রগণের নিকট অনুকরণীয় হবে"— এই হবে শিক্ষকদের মূল আদর্শ। শিক্ষকদের একেবারে ছাত্রদের স্তরে নেমে আসতে হবে, তিনি যদি তা না করে শুধু শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত হন, তাহলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ যে কি হবে, তা অনুমান করবার ভার তোমাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় "অবরোহণ"। এর মানে উপর থেকে একেবারে মাটিতে নেমে আসা নয়। এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি উপকৃত হতে যাচ্ছে, তার স্তরকে গ্রহণ করা মাত্র। শিশু কখনও মেঝে থেকে মায়ের কোলে লাফিয়ে উঠতে পারে না। "আমি অনেক বড়, নীচু হওয়া আমার সাজে না"—মা যদি এমন ভাবেন তাহলে নিজের শিশুকে কোলে নেওয়া আর তার হয়ে উঠবে না। অবনত হলে মা ছোট হয়ে যান না। তেমনি ছাত্রকে শিক্ষা দেবার জন্যে তার স্তরে নেমে এলে কোন শিক্ষক হেয় হবেন না। তা হবে প্রেমের প্রশংসনীয় লক্ষণ মাত্র।

আজকাল অনেক শিক্ষককেই বলতে শোনা যায়, "আজকের ক্লাসে একটি বিষয়ের একটি অধ্যায় আমার জন্যে নির্দিষ্ট। আমার কর্তব্য হল, শুধুমাত্র তাই শেখানো। আমি শুধু তাই করে চলে যাব।" ছাত্ররা কি ঐ পাঠ পরিস্কার ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে? কোন বিষয় কিভাবে, কি উপায়ে শেখাতে হবে? এসব সমস্যা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। শিক্ষক যেরূপ আচরণ শিক্ষা দেন এবং ছাত্রদের কাছ থেকে যে আচরণ আশা করেন,,তার নিজের আচরণও তেমনি হওয়া উচিৎ। প্রেমের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে, শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের ভক্তিও হবে গভীরতর। সার্বিক উন্নতিলাভে ছাত্রদের উৎসাহিত করবার জন্যে শিক্ষকদের

সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকার মাধ্যমে নিজের জীবনকে নষ্ট না করে, শিক্ষক প্রেম দিয়ে তার অন্তরকে প্রসারিত করবেন।

বৈষম্য ভাব যেন শিক্ষকগণ পোষণ না করেন। আগেকার দিনে মুনিঋষিগণ নিজের সন্তান ও অপরাপর শিষ্যদের অভিন্ন স্নেহের চোখে দেখতেন। আমাদের শিক্ষকদের প্রকৃতিও যে অনুরূপ, তা আমরা বিশ্বাস করি না। কোন পরীক্ষাকেন্দ্রে যদি অধ্যক্ষের ছেলে পরীক্ষায় বসে, তাহলে ঐ অধ্যক্ষকে আর কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক দিতে নিযুক্ত করা হয় না, যদি তিনি তার ছেলেকে সাহায্য করেন এবং ভাল নম্বর পাবার জন্যে উত্তর বলে দেন। কিন্তু প্রাচীনকালে আশ্রমে গুরু এমন পক্ষপাতিত্ব দেখাতে পারেন বলে সন্দেহ করা হোত না। আজকাল সর্বস্তরের চিন্তা, বাক্য ও কর্মে অসাধুতা এসে গেছে। তাই এই সাবধানতা। গুরুর মর্য্যাদা ও স্তর অর্জন করবার জন্যে শিক্ষকদের কর্তব্য হল আবেগের বিশুদ্ধিকরণের সাধনায় নিযুক্ত হওয়া। প্রকৃত গুরু অবশ্যই ছাত্রকে মূল্যবান ও সুখী জীবনের দিকে পরিচালিত করবেন। আর প্রকৃত ছাত্র নিশ্চয়ই আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে তাতে সাড়া দেবে।

ছাত্রদের কাজকর্ম এবং চরিত্রের স্বরূপ ও প্রকারের জন্যে শিক্ষকগণই দায়ী। কারণ, তাদের প্রাজ্ঞতা ও নেতৃত্ব ছাত্রদের প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং শিক্ষকদের উচিৎ স্বার্থপরভাবে সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা ও রাজনৈতিক কলাকৌশলকে দূরে সরিয়ে রেখে একমাত্র আধ্যাত্মিক অগ্রগতিকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করা। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকদের ভেতর সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বজায় থাকা দরকার। শিক্ষকদের ভেতরকার পারস্পরিক বিভেদ ও রেষারেষি কিন্তু ছাত্রদের কাছে প্রকাশ হয়ে যায়। তবে, পার্থক্য থাকবেই এবং তা কখনও কখনও প্রয়োজনীয়ও হতে পারে। কিন্তু তা যেন পারস্পরিক সম্পর্ককে কলুষিত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতি নষ্ট এবং শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের কাজকে প্রভাবান্বিত না করে। এসব বিষয়ে তারা নিজেদের ভেতর পরামর্শ ও সহযোগিতা করবেন।

ছাত্রদের ভেতরও আমরা উদ্দেশ্যের সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতার অভাব দেখতে পাই। সদ্ভাব ও সৎ-সঙ্গ বিরল হয়ে এসেছে, পারস্পরিক প্রেম ও সৎ-সঙ্গ লাভের স্পৃহা কমে এসেছে। 'যেমন রাজা তেমনি প্রজা'—এমন একটি প্রবাদ রয়েছে। 'যেমন শিক্ষক তেমনি ছাত্র'—এ বক্তব্যও সমান সত্য বলে মনে হয়। তাই শিক্ষকদের মহৎ চিন্তা ও বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনের প্রতি আগ্রহান্বিত

হতে হবে। পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়নশাস্ত্রের কোন পণ্ডিতের জীববিজ্ঞানের অন্য কোন পণ্ডিতের মত ঐ বিষয়ে জ্ঞান নাও থাকতে পারে। কিন্তু তাদের ভেতর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব থাকতে হবে। কারণ, বিজ্ঞানের যে শাখাতেই তারা পণ্ডিত হোন না কেন, আত্মবিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান তাদের প্রকৃত সত্যের প্রতি পরিচালিত করে, সেই বিজ্ঞানকে আয়ত্ত সকলকেই করতে হবে। আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে আমি বলেছিলাম যে, প্রতিটি বস্তুর ভেতরই শক্তি নিহিত রয়েছে; এক টুকরো কাগজ, এক টুকরো কাপড়—সব কিছুর ভেতর শক্তি সুপ্ত থাকে। এই সুপ্ত শক্তি নিঃশেষিত হলেই মৃত্যু ঘটে; শক্তি এসে পূর্ণ করলে জন্মলাভ হয়। সৎ-চিৎ-আনন্দ হল শক্তি। আমরা (সৎ) হলাম (চিৎ) সুখী (আনন্দ)। শক্তিই হল সব কিছু এবং তা ঈশ্বর হতে প্রাপ্ত। তা হল মানুষের ভিত্তি। কিন্তু আজকাল আমরা এই ভিতের উপর নয়, অন্য কোথাও কাঠামো তৈরী করছি। ভিত্তিস্বরূপ দিব্য সত্তাকে অবহেলা করছি। উদরপূর্তি ও ব্যবহারিক সুখ ও ক্ষমতাবান হবার আশ্বাস যে পাঠ ও বিদ্যা দিয়ে থাকে, আমরা তার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল সব কিছুর অন্তর্নিহিত দিব্যত্ব। সকল সত্তার পেছনে যে একই অস্তিত্ব বিদ্যমান, সেই পরম সত্য সম্পর্কে মানুষকে অবহিত হতে হবে, কিংবা, অন্ততঃপক্ষে প্রেম ও সৌভ্রাতৃত্বের ব্যবহারিক সত্যটিকে জানতে হবে। এ দুটো হল দুটো প্রান্তিক সীমা—প্রারম্ভিক বিন্দু এবং লক্ষ্য—শিক্ষা এদুটো প্রান্তকে সযত্নে পোষণ করবে।